মনীষা

মওলানা আবুল কালাম আজাদ

মনীষী

মওলানা আবুল কালাম আজাদ

العلماء ورثة الانبياء , علماء امتي كانبياء بني اسرائيل — حديث

"আলেমগণ পয়গম্বরগণের উত্তরাধিকারী, আমার মণ্ডলীর আলেমগণ এসরাইল বংশীয় পয়গম্বরগণের সমমর্য্যাদা সম্পন্ন।" হজরত মোহম্মদ।

রেজাউল করীম এম. এ. বি. এল.
প্রণীত

নুর লাইব্রেরী : পাবলিশার
১২।১ সাবেঙ্গ লেন, কলিকাতা

[মূল্য ১৲ টাকা
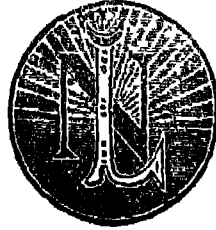
উৎসর্গ পত্র

পরলোকগত পিতৃদেবের

পুণ্য স্মৃতিতে তাঁহার আত্মার

কল্যাণ কামনায়

এই পুস্তকটি

বাংলার

তরুণ ও তরুণীদের করকমলে

উৎসর্গ করিলাম

রেজাউল করীম

সূচীপত্র

ভূমিকা

মহাপুরুষ সৈয়দ জামাল উদ্দীন আফগানি সম্বন্ধে একজন লেখক দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন যে, অত বড় বিপ্লবী মানুষকে তাঁহার জীবদ্দশায় মুসলমান সমাজ ভাল করিয়া চিনিতে পারে নাই। তাঁহার বিপ্লবী আদর্শ, প্রচণ্ড তেজ, অদম্য সাহস ও মৌলিক চিন্তাধারার সুযোগ মুসলমান সমাজ সম্যকভাবে গ্রহণ করিতে সক্ষম হয় নাই। তাই যাহাদের কল্যাণের জন্য তিনি জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, তাহাদের অনেকেই তাঁহাকে এক মুহূর্ত্ত শান্তি দেয় নাই। আরব, মিসর পারস্য, তুরস্ক প্রভৃতি দেশের মুসলমান সমাজ ও রক্ষণশীল নেতাগণ ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের চক্রান্তে পড়িয়া তাঁহাকে গৃহ হইতে গৃহান্তরে, দেশ হইতে দেশান্তরে বিতাড়িত করিয়া বেড়াইয়াছেন। কেহ কেহ তাঁহার প্রাণ নাশের ষড়যন্ত্র করিয়াছে, নির্ব্বাসন, কারাগার—এসবও তাঁহার ভাগ্যে বহু বার হইয়াছে। দেশে-বিদেশে সর্ব্বত্র তাঁহাকে অসহ্য নির্য্যাতন ভোগ করিতে হইয়াছে। তাঁহার রচিত পুস্তকাবলী মুসলিম প্রধান দেশেও বাজেয়াপ্ত হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার প্রজ্বলিত অগ্নিশিখা কেহ নির্ব্বাপিত করিতে পারে নাই। তাঁহার মৃত্যুর বহু যুগ পরে নিকট-প্রাচ্যের প্রত্যেক দেশই বুঝিয়াছে যে, তাঁহার মত সমাজ-হিতৈষী মুসলমান খুব কমই জন্মিয়াছেন। যখন তাহারা তাঁহার বিপ্লবী মনের পরিচয় পাইল, তখন তাহারা তাঁহাকে শ্রদ্ধায় গ্রহণ করিল। কিন্তু তখন তিনি অন্যলোকে চলিয়া গিয়াছেন।

যাহারা একদা জামাল উদ্দীনের অমূল্য গ্রন্থরাজি বাজেয়াপ্ত করিয়াছিল, তাহাদেরই উত্তরাধিকারিগণ বহু ব্যয় করিয়া সাদরে সেই সব গ্রন্থ পুনর্মুদ্রিত করিয়াছে। আজ মুসলিম জগতের প্রত্যেক কেন্দ্রে মহাডম্বরে তাঁহার স্মৃতি রক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে। প্রত্যেক দেশেই এই ভাবে যুগান্তকারী মনীষীদেরকে প্রথম জীবনে বহু নির্য্যাতন সহ্য করিতে হইয়াছে, এবং পরবর্ত্তীকালে তাঁহারা এই ভাবেই সম্মানও পাইয়াছেন। নবযুগের দ্বিতীয় জামাল উদ্দীন মওলানা আবুল কালম আজাদ সম্বন্ধেও এই কথাই বলা চলে। মনীষী আবুল কালাম আজাদ জামাল উদ্দীনের মতই সমগ্র জীবন দেশ ও সমাজ সেবায় নিয়োজিত করিয়াছেন। তাঁহার সমাজ-সেবা সখের সমাজ-সেবা নহে। একদল নেতা আছেন যাঁহারা প্রথম জীবনে চাকরী-বাকরী করিয়া, অথবা ব্যবসা-বাণিজ্য করিয়া কোটি-পতি, লক্ষ-পতি হইয়া পরিণত জীবনে সুলভ রাজনীতির ব্যবসায় করিয়া দেশ বিদেশে সুনাম অর্জ্জন করেন। মওলানা আজাদের রাজনীতি ও দেশ-সেবা সে ধরণের নহে। তিনি জানিতেন, দেশ-সেবার পথ বড়ই বিপদ সঙ্কুল,—আর জানিয়া শুনিয়াই তিনি এই পথই বাছিয়া লইয়াছেন। কখনও কাহারও অনুগ্রহের প্রত্যাশী হন নাই, কখনও নেতৃত্বের অভিলাষী হন নাই। দেশ ও সমাজ সেবার জন্যই তিনি জীবনকে উৎসর্গ করিয়া দিয়াছেন। সেই সুকুমার বাল্যকাল হইতে অদ্যাবধি একটা সুমহান আদর্শকে অবলম্বন করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছেন। সমাজের বিভিন্ন স্তরে যখন রাজনীতি-জ্ঞানের উন্মেষ হয় নাই, তখন সুদক্ষ গুরুর মত তাহাকে রাজনীতি শিক্ষা দিয়াছেন। যখন প্রতিক্রিয়াশীল মতবাদ সমাজের পরতে পরতে প্রবিষ্ট হইয়া তাহার চৈতন্যোৎপাদনে ব্যাঘাত জন্মাইতেছিল, তখন তিনি

সমস্ত বিপদ ও দুর্ভোগ স্বীয় স্কন্ধে লইয়া সমাজের মনোবৃত্তির পরিবর্ত্তন করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন। ইসলামের আদর্শ সম্বন্ধে যখন সমাজের ধারণা অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল, তখন মওলানা আজাদ তাঁহার অপূর্ব্ব পাণ্ডিত্য প্রভাবে সমাজের সেই ধারণা দূর করিবার জন্য দিনের পর দিন অক্লান্ত ভাবে লেখনী পরিচালনা করিয়া বহুলাংশে সফলকাম হইয়াছিলেন।

ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদ যখন বিশ্ব-মুসলিমকে নানা প্রকার ষড়যন্ত্রের দ্বারা এক এক করিয়া গ্রাস করিতেছিল, তখন এই শাস্ত্রজ্ঞ মওলানা আজাদ—প্রাণের ভয় না করিয়া রাজরোষে পতিত হইবার ভয় না করিয়া—অকুণ্ঠিত চিত্তে মুসলমানের সম্মুখে তাহাদের আসন্ন বিপদের কথা প্রকাশ করিয়াছিলেন। আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতির পট-ভূমিকা ব্যতীত ভারতীয় সমস্যার আলোচনা করা চলে না, এই মহা সত্য তিনি বহু পূর্ব্বে দেশবাসীর নিকট নিবেদন করিয়াছিলেন। ত্রিপলি যুদ্ধ ও বলকান যুদ্ধের সময় তিনি ভারতীয় মুসলমানের নিকট এক নূতন তথ্যের সন্ধান দিলেন। তিনি দেখাইলেন যে, ভারতের স্বাধীনতা ব্যতীত নিকট-প্রাচ্যের কোন মুসলিম প্রধান দেশ নিরাপদ নহে। বিগত প্রথম মহাসমরের পর তাঁহার এই কথার সার্থতা পরিষ্কার ভাবে বুঝা গেল। খিলাফত যখন বিপন্ন, মিত্রপক্ষীয় শক্তিবর্গ যখন গোপনে গোপনে সমগ্র তুর্কি সাম্রাজ্যকে নিজেদের মধ্যে ভাগ-বাঁটোয়ারা করিবার জন্য হীনতম ষড়যন্ত্র করিতেছিল, তখন আর কেহ নহে—এই মওলানা আজাদই ভারতীয় মুসলমানকে তাহার আশু বিপদের সঙ্কেত ধ্বনি দিতে একটুকুও কুণ্ঠিত হন নাই। আজ যখন সাম্রাজ্যবাদের ভেদনীতির কুপ্রভাবে ভারতীয় মুসলমান সমাজের মধ্যে দাস-মনোভাব বিষের মত ক্রিয়া করিতেছে, তখনও মওলানা

আজাদ সুদক্ষ চিকিৎসকের মত সেই প্রাণান্তক বিষের প্রভাব হইতে সমাজকে রক্ষা করিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছেন। বিভ্রান্ত সমাজকে সৎপথে আনিবার জন্য তিনি যে পতাকা হাতে লইয়াছিলেন, আজিও তাহা অবনমিত করেন নাই। কত ঝড় আসিয়াছে, কত বিপদের সম্মুখীন হইয়াছেন, কত নির্য্যাতন সহ্য করিয়াছেন—কিন্তু মওলানা আজাদ এক চুলও নিজের আদর্শ ও পথ হইতে বিচ্যুত হন নাই। এই একটি মানুষ—যিনি সংগ্রাম ব্যতীত আর কিছুই জানেন না, যিনি নিজের ব্যক্তিগত সুখের দিকে কখনও দৃকপাত করেন নাই—নিজের বলিতে যাঁহার কিছুই নাই,—এই লোক যে কোন দেশের ও যে কোন জাতির শ্রদ্ধা ও গৌরবের আস্পদ। এমন একাত্ম ভাবে দেশ ও সমাজ-সেবার দ্বিতীয় উদাহরণ মুসলমানদের মধ্যে আর নাই। কিন্তু এহেন মনীষীর ভাগ্যে জামাল উদ্‌দীনের মতই জুটিয়াছে শুধু লাঞ্ছনা, নির্য্যাতন। একদিকে সরকারের রুদ্রনীতি, আর একদিকে অন্ধ সমাজের লাঞ্ছনা—এই দুই দিকের চাপ তাঁহাকে রুদ্ধশ্বাস করিতে চাহিয়াছিল। কিন্তু প্রদীপ্ত সত্যকে কেহ নির্ব্বাপিত করিতে পারে নাই। তাঁহার বিপ্লবী-মন সমাজ বরদাস্ত করিতে পারে নাই। তাঁহার চির বিদ্রোহী অন্তর সরকারকে শশব্যস্ত করিয়া রাখিয়াছে। স্বাধীনতা-সংগ্রামের এই বীর পুরোহিতকে বহু বার কারাবরণ করিতে হইয়াছে। আর বিপ্লবাত্মক ভাবধারা প্রচারের জন্য এবং সমাজের গতানুগতিকতার মূলে আঘাত করার জন্য তাঁহাকে সমাজের তরফ হইতে নিন্দাগ্লানি কম সহ্য করিতে হয় নাই।

রাজনৈতিক সভামঞ্চে মওলানা আজাদের বক্তৃতা শুনিলে মনে হয়,

এমন তেজ—এমন সূক্ষ্ম সমালোচনা—এমন সুগভীর বাস্তব জ্ঞান বুঝি আর কোথাও নাই। আবার ধর্ম্ম সভায় তাঁহার বক্তৃতা শুনিলে মনে হয়, ইসলামের এমন উদার ও মহান ব্যাখ্যাও যেন কোথাও শুনি নাই! কি গভীর শাস্ত্র-জ্ঞান, রাজনীতির কি অন্তর্ভেদী সমালোচনা, ইসলামের প্রতি কি অকৃত্রিম অনুরাগ। এই একটি লোক যাহাকে সাম্রাজ্যবাদ কখনও বিভ্রান্ত করিতে পারে নাই, ক্ষণিক সুখ সুবিধার মোহ কখনও যাহাকে কর্ত্তব্যচ্যুত করিতে পারে নাই। তিনি নিন্দা, গ্লানি, অত্যাচার, নির্য্যাতন—সবই সহ্য করিয়াছেন, কিন্তু যাহা সত্য বলিয়া জানেন তাহা হইতে কখনও স্খলিত হন নাই। গড্ডালিকা স্রোতে ভাসিয়া গেলে তাঁহার ব্যক্তিগত জীবন কত সুখকর হইত, ঐহিক বিষয়ে তিনি কত লাভবান হইতেন। কিন্তু কোনও দিন তিনি নিজের আদর্শের ও বিবেকের বিরুদ্ধে যান নাই। মুসলমান সমাজ ধন্য যে, তাহারা আবুল কালাম আজাদের মত একজন সত্যের চির উপাসক ও আদর্শের একনিষ্ঠ সেবককে তাহাদের মধ্যে পাইয়াছে। কিন্তু এহেন মহা মনীষীর প্রতি মুসলমান সমাজ সদ্ব্যবহার করে নাই। যাহারা জামাল উদ্দীনকে লাঞ্ছিত করিয়াছে, যাহাদের ধর্ম্ম-গুরু কামাল পাশার মত প্রচণ্ড বিপ্লবী বীরের মস্তক বিক্রয় করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই, তাহাদের উত্তরাধিকারীদের নিকট আর কি আশা করা যাইতে পারে? কিন্তু ভবিষ্যতের উদ্বোধিত সমাজ দেখিবে (যেমন দেখিয়াছে জামাল উদ্দীনের ভবিষ্যতের উত্তরাধিকারিগণ) যে, যে যুগে ধর্ম্মান্ধতা সমাজকে পাইয়া বসিয়াছিল, যে যুগে মুসলমান সমাজ মেকি ও নকল বস্তুর মোহে সাম্রাজ্যবাদের ক্রীতদাস হইয়া পড়িয়াছিল, এবং সাম্রাজ্য-বাদের পদতলে আত্মবিক্রয় করিয়াছিল, সেই যুগে সেই সমাজের মধ্যে

আবুল কালামের মত মনীষী উদ্ভূত হইয়া তাহাদের সম্মুখে একটা মহান আদর্শ তুলিয়া ধরিয়াছিলেন, তাহাদেরকে দেখাইয়াছিলেন যে, গতানুগতিকতার পথে সমাজের মঙ্গল নাই—তাহাদেরকে এমন একটা পথের নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন যাহা প্রত্যেক যুগের বিপ্লবী ও দূরদর্শী নেতারা দিয়া থাকেন। তখন হয়ত আমাদের উত্তরাধিকারিগণ এ যুগের সমাজকে এই বলিয়া ধিক্কার দিতে থাকিবে যে, ইহারা এতই মোহাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল যে, তাহারা মওলানা আবুল কালামকে চিনিতে পারে নাই। আজ জামাল উদ্দীন সর্ব্বত্র যে সম্মান পাইতেছেন, উত্তরকালে মওলানা আজাদও তদ্রূপ সম্মান পাইবেন। যে দিক দিয়াই দেখি না কেন, মওলানা আজাদ একজন যুগ প্রবর্ত্তক মনীষী, বিংশ শতাব্দীর "মোজাদ্দেদ"।

রাজনৈতিক জীবনে বহু নেতা বহু ডিগ্‌বাজী খাইয়া থাকেন, তাঁহাদের প্রথম জীবনের নীতি ও আদর্শের সহিত শেষ জীবনের নীতি ও আদর্শের কোনরূপ সামঞ্জস্য থাকে না, তাঁহারা শেষ জীবনে সম্পূর্ণ বিপরীত পন্থা অবলম্বন করেন। মিঃ র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড প্রথম জীবনে ছিলেন শ্রমিক দলের নেতা, পরে হইয়া পড়িলেন রক্ষণশীল দলের প্রধান পৃষ্ঠপোষক। সার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মিঃ বিপিনচন্দ্র পাল, মিঃ, এম, এ জিন্না, শ্রীবারীন্দ্র-কুমার ঘোষ, মওলানা মোহম্মদ আকরম খাঁ প্রমুখ নেতাগণ কোথা হইতে কোথায় গিয়া পড়িয়াছেন তাহা সকলেই অবগত আছেন। কিন্তু ইহার কারণ কি? ব্যক্তিগত স্বার্থ ইহার মূল কারণ নয়। ইহার মূল কারণ দূরদর্শিতার অভাব। তাঁহারা প্রথম জীবনে ক্ষুদ্র সীমার মধ্যে কাজ করিয়া অনাগত যুগের বিরাট পরিবর্ত্তনের ও যুগান্তকারী বিপ্লবের কথা ভাবিতে পারেন নাই। তাঁহারা

একটু অগ্রসর হইয়াই মনে করিয়াছিলেন—উহাই বুঝি প্রগতির চরম বিকাশ, উহা অপেক্ষা আর এক পা অগ্রসর হওয়া চলে না। নিজেদের পরিকল্পিত আদর্শকে তাঁহারা চরম আদর্শ বলিয়া বিবেচনা করিয়াছিলেন। অন্য কাহাকে আর একটু অগ্রসর হইতে দেখিলে তাঁহারা ভয়ে অস্থির হইয়া পড়িতেন। এত দিনের সব সাধনা বুঝি পণ্ড হইয়া যাইবে! কিন্তু যাঁহারা সত্যিকারের বিপ্লবী, তাঁহারা এরূপ করেন না। তাঁহারা সব সময়েই অনাগত যুগের বিপ্লব, আলোড়ন ও পরিবর্ত্তনের কথা ভাবিয়া থাকেন। সেই জন্য তাঁহারা যেখানে দাঁড়াইয়া কার্য্য আরম্ভ করেন, সেইখানেই স্থির হইয়া থাকেন না। যুগের প্রয়োজনমত প্রগতির আদর্শ ও সীমা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নিজেরাও সেই তালে তালে অগ্রসর হন। সেই জন্য তাঁহারা কোন যুগেই সে-কেলে ও রক্ষণশীল হইয়া থাকেন না। প্রাচীনত্বের দোহায় দিয়া কোন কর্ম্মপন্থাকে পবিত্র ও অলঙ্ঘনীয় বলিয়া তাঁহারা মনে করেন না। তাঁহারা জানেন যে, রাজনীতিতে অলঙ্ঘ্য ও পবিত্র (Sacrosanct) বলিয়া কোন বস্তু নাই। ক্রমবর্দ্ধমান জন-জাগরণের সহিত রাজনীতিক আদর্শ, অধিকার ও কর্ম্মপন্থার সীমা পরিবর্ত্তন হয়। তাই তাঁহারা প্রত্যেক যুগে প্রত্যেক পরিবর্ত্তন ও বিপ্লবের মধ্যেও অনাগত ভবিষ্যতের পানে চাহিয়া থাকেন। ভাবটা এইরূপ, আরও বিপ্লব আসিবে, তাহাও সহ্য করিতে হইবে। তাঁহাদের প্রত্যেক কর্ম্মপন্থায় ভবিষ্যতের বিপ্লবের ইঙ্গিত থাকিয়া যায়। তাঁহারা চির নবীন ও চির সজীব। মওলানা আবুল কালাম আজাদ এই ধরণের মনীষী, এই ধরণের বিপ্লবী। মুসলমান সমাজ যখন আলিগড় স্কুলের প্রভাবে পড়িয়া প্রগতিমূলক রাজনীতির কথা চিন্তা করিত না, তখন তিনি তাহাদের সম্মুখে

স্বাধীনতাব আদর্শ তুলিয়া ধবিলেন, তাহাঁদেবকে আলিগডেব বিষাক্ত প্রভাব হইতে মুক্ত কবিতে সমস্ত শক্তি নিয়োজিত কবিলেন, মুসলিম লীগকে ভিক্ষাবৃত্তি পবিত্যাগ কবিতে উদ্দীপিত কবিলেন। এবং তাঁহাবই প্রভাবে লীগ বাজানুগত্যেব ধাবা উঠাইয়া দিয়া রাজনৈতিক কর্ম্মধাবা গ্রহণ কবিল।

নিকট-প্রাচ্যে সাম্রাজ্যবাদেব লীলাখেলা দেখিয়া এবং ভাবতে ভেদনীতিব উলঙ্গ মূর্ত্তি দেখিয়া মওলানা আজাদ এদেশবাসীকে আন্তর্জ্জাতিক সমস্তাব পট-ভূমিকায ভাবতেব সমস্যা পাঠ কবিতে শিক্ষা দিলেন। খিলাফতেব প্রশ্নে তিনি মুসলমান সমাজকে সংগ্রামেব সম্মুখে লইয়া গেলেন। আইন অমান্য আন্দোলনেব সময তিনি স্বাধীনতাব পতাকা ধাবণ কবিযা সহাস্যবদনে কাবাববণ কবিলেন। স্বদেশী যুগে বিপ্লবাত্মক বাজনীতিতে যোগ দিতেও তিনি কুণ্ঠিত হন নাই। আব আজ যখন সাম্প্রদাযিকতাব আগুন দেশেব সর্ব্বত্র প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে, তখন তিনি মুসলমানকে বিশেষ সুবিধা অপেক্ষা পবিপূর্ণ স্বাধীনতাব কথা চিন্তা কবিতে উপদেশ দিতেছেন। এই ভাবে সত্যিকাবেব বিপ্লবীব মত তিনি আজ দীর্ঘকাল ধবিয়া সমাজ ও দেশেব সেবা কবিযাছেন। ধাপে ধাপে প্রগতিব পথে তিনি অগ্রসব হইয়াছেন, কিন্তু কখনও প্রতিক্রিয়াশীল ও বক্ষণশীল দলেব আদর্শ গ্রহণ কবেন নাই। তিনি জীবনে কখনও বাজনৈতিক ডিগবাজী খান নাই। সহকর্ম্মীদেব সহিত মতভেদেব কাবণে তিনি কখনও দলাদলি কবেন নাই। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষযকে কেন্দ্র কবিয়া তিনি কখনও ভূয়া দল গঠন কবেন নাই, বা কোন ভূযা দলেব সংস্রবেও কখনও আসেন নাই। কর্ত্তৃপক্ষেব ভেদনীতিব ফলস্বরূপ

যে সব দল উপদল আজ দেশের স্বাধীনতার পথে কণ্টকস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তিনি সেগুলির সহিত সংস্রব রাখিতে পারেন নাই। তিনি মুসলমানের তথা দেশের সত্যিকারের বন্ধু। তিনি দেখিয়াছেন, তাঁহারই চোখের সম্মুখে নিকট-প্রাচ্যের মুসলিম রাষ্ট্রগুলির উপর সাম্রাজ্যবাদ কিরূপ চক্রান্তজাল বিস্তার করিয়া তথায় নিজেদের প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। অশ্রুপূর্ণলোচনে তিনি দেখিলেন, ভারতীয় মুসলমানকে বিভ্রান্ত করিবার জন্য সেইরূপই ষড়যন্ত্র হইতেছে। চোখের উপর এত সব উদাহরণ বিদ্যমান থাকিতে মওলানা আজাদ নিজেকে সাম্রাজ্যবাদের খেলার পুতুলে পরিণত হইতে দেন নাই। তিনি তাই পুনঃ পুনঃ সমাজকে সাবধান করিয়া দিয়াছেন: "ওপথে মুক্তি নাই, ও পথ ছাড়।"

আজ এই মহা মনীষীর ক্ষুদ্র জীবনী বাঙ্গালী পাঠক সমাজের সম্মুখে উপস্থিত করিলাম। ইহার সমস্ত উপাদান শ্রীযুক্ত মহাদেব দেশাই প্রণীত "মওলানা আবুল কালাম আজাদ" নামক ইংরাজী গ্রন্থ হইতে গ্রহণ করিয়াছি। ইহাতে শ্রীযুক্ত দেশাই মহাশয়ের অনুমতি পাইয়াছি, এই জন্য তাঁহার নিকট চির কৃতজ্ঞ। আশা করি বাঙ্গালী পাঠকগণ ইহাতে মওলানা আজাদের সত্যিকারের পরিচয় পাইবেন। সমাজ যদি এই মনীষীকে চিনিতে পারে, তবে পরিশ্রম সার্থক হইল মনে করিব। ইতি

১লা আগষ্ট, ১৯৪২ **রেজাউল করীম**

মনীষী

মওলানা আবুল কালাম আজাদ

সূচনা

মওলানা আবুল কালাম আজাদ যখন রামগড় কংগ্রেসের জন্য সভাপতি নির্ব্বাচিত হন (মার্চ মাস, ১৯৪০), তখন তিনি ভোট পাইয়াছিলেন ১৮৫৪টি, আর তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী ভোট পান মাত্র ১৮৩টি। ইহা খুব আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। সেবার তিনিই যে সভাপতি নির্ব্বাচিত হইবেন ইহা একরূপ স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপার বলিয়া লোকে জানিত। অনেকে এই নির্ব্বাচন হইতে ইহাই দেখাইতে চাহিয়াছিলেন যে, কংগ্রেস মুসলমানের শত্রু নহে, ববং মুসলমানের স্বার্থের জন্যও সংগ্রাম করিয়া থাকে। মুসলমান-সমাজ কংগ্রেস পরিত্যাগ করে নাই, তাহাদের একটা বৃহৎ অংশ কংগ্রেসের ছায়াতলে আশ্রয় লইয়াছে। আবার অনেকে মনে করেন, যে সব মুসলমান দাবী করেন যে, লীগই মুসলমান সমাজের একমাত্র প্রতিষ্ঠান, মওলানা আজাদ সাহেবের নির্ব্বাচন

তাঁহাদেরকে মুখের উপর জবাব দিয়া ঘোষণা করিতেছে যে, লীগের উক্ত প্রকার দাবী সত্য নহে। এসব কথা সত্য হইতে পারে, কিন্তু এ নির্ব্বাচনের সহিত হিন্দু-মুসলমান সমস্যার কোন সংস্রব নাই। মওলানা আজাদ সাহেব ইহার বহু পূর্ব্বেই একবার সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। ইহার পরেও আরও দু'একবার হইতে পারিতেন। কিন্তু তিনি স্বেচ্ছায় সে সম্মান পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তাঁহার ব্যক্তিত্ব, তাঁহার ত্যাগ, মনীষা ও অসামান্য প্রতিভাই তাহাকে সভাপতি নির্ব্বাচিত করিয়াছে। হিন্দু-মুসলমান সমস্যাকে ইহার সহিত জড়িত করা উচিত নহে। একজন মুসলমানের পক্ষে সভাপতি নির্ব্বাচিত হওয়া কংগ্রেসের ইতিহাসে কোন নূতন ঘটনা নহে। গান্ধী-প্রভাবের পূর্ব্বে বহু প্রথিতযশা মুসলমান কংগ্রেসের সভাপতি হইয়াছেন—যেমন হইয়াছেন খৃষ্টান ও পার্শী, এবং গান্ধী-প্রভাবের পরেও চারিজন মুসলমান কংগ্রেসের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। তন্মধ্যে মওলানা আজাদ নিজেই একজন (১৯২৩ সালে)। তখন তাঁহার বয়স মাত্র পঁয়ত্রিশ বৎসর ছিল। সুতরাং ১৯৪০ সালে মওলানা আজাদ সাহেবের সভাপতি নির্ব্বাচিত হওয়ার যদি কোন তাৎপর্য্য থাকে, তবে তাহা এই যে, কংগ্রেস ভারতের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে তাহার গৌরবান্বিত পদে অধিষ্ঠিত করিতে কখনও কাতর হয় নাই। যোগ্যতা ব্যতীত অন্য কোন বিবেচনার দ্বারা কংগ্রেস পরিচালিত হয় না।

ইউরোপ মওলানা আজাদকে ভাল করিয়া জানে না। কিন্তু ভারতবর্ষ তাহার প্রথম সেবককে বেশ ভাল করিয়াই জানে। গান্ধীজীর রাজনীতি-ক্ষেত্রে প্রবেশের বহু পূর্ব্বে এই মওলানা "বিদ্রোহী" বলিয়া সুখ্যাতি

অর্জ্জন করিয়াছিলেন। বিগত প্রথম মহাসমরের সময় গান্ধীজী ব্রিটিশ সরকারের সহিত সহযোগিতা করিয়াছিলেন। তিনি স্বেচ্ছায় ব্রিটিশের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করিয়াছিলেন। কিন্তু মওলানা আজাদ সেই সময় নিজেকে "বিদ্রোহী" বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন এবং সেই অপরাধে ভারত সরকারের আদেশে গ্রেপ্তার হইয়া কয়েক বৎসর অন্তরীণে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। ইহা একটা অদ্ভুত ঘটনা যে, কংগ্রেস যখন বর্ত্তমান সমরে অসহযোগিতা করিতেছে, সেই সময় ভারতমাতার এমন একজন কৃতী সন্তান তাহার কর্ণধার হইয়াছেন, যিনি দুই যুগ পূর্ব্বে ঠিক একই পরিস্থিতির মধ্যে ব্রিটেন যখন আর একটা বিশ্বসমর পরিচালন করিয়াছিল, তখন তীব্রভাবে তাহার কার্য্যের সমালোচনা করিয়াছিলেন এবং তাহার সহিত সহযোগিতা করিতে বিরত হইয়াছিলেন। সে যুগে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ও সম্পাদিত "আল-হেলাল" দেশময় এমন একটা প্রভাব বিস্তার করিতে সক্ষম হইয়াছিল এবং সরকারী পলিসির এমন নির্ভীক সমালোচনা করিয়াছিল যে, সরকার প্রথমে ইহার জামিন বাজেয়াপ্ত করিলেন এবং পরে মওলানাকেও অন্তরীণে অবরুদ্ধ করিলেন।

এই অন্তরীণ তাঁহাকে ব্রিটিশ শাসনের পক্ষপাতী করিল না—তিনি ইহার তীব্র সমালোচক হইয়া উঠিলেন। ১৯২০ সালে যখন তিনি মুক্তি পাইলেন, তখন তিনি দেখিলেন যে, স্বদেশের বহু লোকের ভ্রম দূর হইয়াছে। তাহারা সরকারের প্রতি আনুগত্য পরিত্যাগ করিয়াছে। ইহারই জন্য তিনি দীর্ঘ দিন সাধনা করিয়াছিলেন। তিনি দেখিলেন, তাঁহার সুদীর্ঘকাল পোষিত স্বপ্ন এতদিনে বুঝি সত্যে পরিণত হইতে চলিয়াছে।

ইহার পূর্ব্বে তিনি এই দিনের আগমনী বাণী শুনাইবার জন্য গভীর গর্জ্জনে সারা ভারত প্রকম্পিত করিয়াছিলেন। আজ দেখিলেন, তাঁহার সে গর্জ্জন ব্যর্থ হয় নাই। তিনি আবার মুসলমান সমাজকে বলিলেন: "তোমরা যে পথে যাইতেছ, সেখান হইতে সরিয়া আইস। তোমরা ভাল করিয়া অনুধাবন কর যে, এদেশের হিন্দুদের মত তোমরাও একই জন্মভূমির সন্তান। একই সমুদ্রে দুই সম্প্রদায়কে সাঁতার কাটিয়া তীরে উঠিতে হইবে। অথবা একই সঙ্গে তোমাদিগকে অকূল পাথারে ডুবিতে হইবে।" কারাগার হইতে মুক্তি পাইয়া তিনি দেখিলেন যে, নানাদিকের প্রভাবের চাপে ঘটনা এমনভাবে গিয়াছে যে, হিন্দু মুসলমান আজ ভাল করিয়া বুঝিয়াছে যে, তাহাদিগকে এক হইতেই হইবে, একই সঙ্গে বসবাস করিতে হইবে, একই সঙ্গে সকল কাজ করিতে হইবে এবং একই সঙ্গে তাহার ফল ভোগও করিতে হইবে। এই দৃশ্য দেখিয়া তিনি মনে বড়ই আনন্দ পাইলেন। ইহার পর হইতে তিনি হিন্দু, মুসলমান, পার্শী, শিখ, খৃষ্টান—ইহাদের সকলের সঙ্গে আপনার ভাগ্যকে জড়াইয়া ফেলিলেন। সাম্প্রদায়িকতার উগ্রতম বিকাশও তাঁহাকে এই আদর্শ হইতে একপদও স্খলিত করিতে পারে নাই। রামগড়ের সভাপতির আসন হইতে তিনি দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেন,—"আমি ১৯১২ সালে মুসলমান সম্প্রদায়কে যে 'ইশুর' উপর দাঁড়াইয়া সম্বোধন করিয়াছিলাম, আজিও ঠিক সেই 'ইশুর' উপর দাঁড়াইয়া আছি। সেই সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত যে সব ঘটনা ঘটিয়াছে, আমি সে সবই চিন্তা করিয়াছি। আমার চক্ষু তাহা দেখিয়াছে এবং আমি মনে মনে তাহা বিবেচনা করিয়াছি। এই সব ঘটনাকে আমি নিষ্ক্রিয় দর্শকের মত

দেখি নাই, আমি সর্ব্বক্ষণই উহাদের মধ্যে ছিলাম, উহাতে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করিয়াছি, যত্নসহকারে প্রত্যেকটি ঘটনা পরীক্ষা করিয়াছি। আমি যাহা দেখিয়াছি ও লক্ষ্য করিয়াছি, তাহা অস্বীকার করিতে পারি না, আমার বিশ্বাসের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে পারি না। আমার বিবেকের বাণীকে দাবাইতে পারি না। সমগ্র যুগ ধরিয়া আমি যাহা বলিয়াছি, আজ আমি তাহারই পুনরাবৃত্তি করিব এবং বলিব যে, ১৯১২ সালে তাহাদের জন্য যে পথের নির্দ্দেশ দিয়াছিলাম, আজিও ভারতের নয় কোটি মুসলমানের সেই পথ ব্যতীত অন্য পথ নাই।" দেশে সাম্প্রদায়িক বিবাদ নানা বীভৎস মূর্ত্তি ধরিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। পূর্ব্বে যাঁহারা বন্ধু ও সহকর্ম্মী ছিলেন, তাঁহাদের অনেকে পরস্পরের শত্রু হইয়া পড়িয়াছেন, কেহ কেহ বিভিন্ন দলে চলিয়া গিয়াছেন এবং একে অপরকে গালাগালি দেওয়াকেই জীবনের প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিতেছেন। সময়ের গতির সহিত বন্ধুভাবাপন্ন দুই সম্প্রদায় আজ কলহ-বিবাদে রত। কিন্তু এই পরিবর্ত্তন ও দল ভাঙ্গাভাঙ্গির মধ্যে মওলানা আজাদ আজিও সুদৃঢ় পর্ব্বতের মত অটল ও অপরিবর্ত্তনীয় হইয়া রহিয়াছেন। তাঁহার সাবধান-বাণী নিষ্ফল হয় নাই। তাঁহার ভবিষ্যৎ দৃষ্টি ব্যর্থ হয় নাই। আজ যদি সমগ্র মুসলমান সমাজ তাঁহাকে পরিত্যাগ করে, তাঁহাকে কুৎসিৎভাবে নিন্দা করে, তবুও তিনি নিজের আদর্শের উপর দৃঢ়ভাবে দাঁড়াইয়া রহিবেন। তিনি একাকী দাঁড়াইয়া সমাজের অন্ধমানসিকতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে থাকিবেন। হিন্দু-মুসলমানের একতায় তাঁহার অগাধ বিশ্বাস। তাহাদের জন্য একই গন্তব্যস্থান সম্বন্ধে তাঁহার বিশ্বাস পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর দৃঢ়

হইয়াছে। তাহার আদর্শের এই দিকটাই তাঁহাকে দেশের কোটি কোটি লোকের নিকট প্রিয় করিয়া তুলিয়াছে।

পাশ্চাত্য দেশের বহু পণ্ডিত সার সৈয়দ আহ্‌মদ্ খানের জীবনচরিত ভাল করিয়া জানেন। তাহারা তাঁহার বিষয় আলোচনা করেন। কিন্তু মওলানা আজাদ সাহেব সার সৈয়দ আহ্‌মদ অপেক্ষা অধিক মনীষাসম্পন্ন ও প্রতিভাশালী ব্যক্তি। তাঁহার শক্তি ও দৃঢ়তাও অপার। অথচ এই মহৎ ব্যক্তির বিষয় ইংলণ্ড ভাল করিয়া জানিতে চাহে না। ইহার কারণও আছে। একথা সত্য যে, সার সৈয়দ আহ্‌মদ্ মুসলিম মানসিকতার মধ্যে একটা অপূর্ব্ব বিপ্লব আনিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি ব্রিটিশ জাতির প্রতি এরূপ অনুরক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, ভারতে ব্রিটিশ শাসনকে বিধাতার আশীর্ব্বাদ বলিয়া মনে করিতেন। আর সেই জন্যই তিনি ছিলেন ইহার প্রচণ্ড সমর্থক। কিন্তু মওলানা আজাদ একটু স্বতন্ত্র ধরণের লোক। বিশ্ববিখ্যাত বিপ্লবী নেতা সৈয়দ জামালুদ্দিন আফগানির সহিত তাঁহার তুলনা হইতে পারে। বস্তুতঃ, জামালুদ্দিনের পর এত বড় প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি সমগ্র মুসলমান সমাজে জন্মগ্রহণ করেন নাই। মওলানা আজাদ সাহেব জামালুদ্দিনের মতই প্রথম হইতে বিদেশী শাসনের বিরোধী ছিলেন। প্রায় পঁচিশ বৎসর ধরিয়া তিনি একাকী সংগ্রাম করিয়াছিলেন। জামালুদ্দিনের মত সরকারী দলিলপত্রে তিনি 'বিদ্রোহী' (Rebel) বলিয়া কথিত আছেন। পার্থক্য এইখানে যে, জামালুদ্দিন সহিংস 'বিদ্রোহী', আর মওলানা আজাদ 'অহিংস বিদ্রোহী'। তিনি আজীবন স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করিয়া আসিতেছেন, কিন্তু ইংরেজ জাতির বিরুদ্ধে ঘৃণার ভাব পোষণ করেন না।

এই দেশজোড়া সাম্প্রদায়িকতার যুগে মহাত্মা গান্ধী ও পণ্ডিত জওযাহরলাল নেহরুর মত মওলানা আবুল কালাম আজাদ সর্ব্বপ্রকার ক্ষুদ্রতা ও দীনতার উর্দ্ধে থাকিয়া দেশবাসীর সম্মুখে স্বাধীনতা ও একতার বাণী প্রচার করিয়া আসিতেছেন। সুতরাং তাঁহার কর্ম্মজীবনের সহিত প্রত্যেক ভারতবাসীর পরিচয় থাকা দরকার। তাহা হতাশার মধ্যে আশার আলো সঞ্চার করিবে।

জন্ম, বংশপরিচয় ও বাল্যজীবন

মওলানা আজাদের পূর্ব্বপুরুষগণ বিদ্যাবত্তা, জ্ঞান ও সুফী মনোভাবের জন্য সর্ব্বত্র সম্মানিত ছিলেন। তিনি এমন একজন মহাপুরুষ হইতে উদ্ভূত হইয়াছেন, যিনি সম্রাট আকবরের সময় পণ্ডিত ও সাধু বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার নাম হজরত শেখ জামালুদ্দিন। তিনি নিজে ছিলেন একজন প্রথম শ্রেণীর সুফী। সংসারের প্রতি তাঁহার কোন আসক্তি ছিল না। কেবল ধ্যান, ধারণা ও ধর্ম্মপ্রচার করিয়া জীবন যাপন করিতেন। তাঁহার রচিত কতকগুলি গ্রন্থ এখনও উচ্চ প্রশংসা পাইয়া থাকে। তাঁহার রচিত হাদিসের ভাষ্য আজিও একখানি দলিলপূর্ণ পুস্তক বলিয়া পণ্ডিত সমাজে আদৃত। তাঁহার বহু শিষ্য ছিল। আকবরের ভ্রাতা খানে আজম তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। সম্রাট আকবর তাঁহাকে ধর্ম্মশিক্ষার কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের প্রধান অধ্যক্ষের পদ দিয়া তাঁহাকে রাজসম্মানে বিভূষিত করিতে চাহিয়াছিলেন। তাছাড়া জায়গীর ও মাসিক ভাতা বাবদে বহু ধনসম্পদ দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। কিন্তু সুফী জামালুদ্দিন রাজার এই অযাচিত দান প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। রাজাকে দৃপ্তভাবে জানাইয়াছিলেন, দারিদ্র্যই আমার ভূষণ—রাজার দান গ্রহণ করিয়া আমি আমার আত্মাকে কলুষিত করিব না। তৎপর তাঁহার জীবনে এমন এক সময় আসিল, যখন তাঁহাকে সম্রাটের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাইতে হইয়াছিল এবং সেইজন্য তিনি আকবরের বিরাগভাজন হইয়াছিলেন। কিন্তু তবুও দিনেকের তরে সম্রাটের নিকট মাথা

নত করেন নাই। ঘটনাটি এইরূপ :—একবার আকবরের বিখ্যাত সভাসদ আবুল ফজল প্রস্তাব করেন যে, সম্রাট আকবর কেবল পার্থিব বিষয়ের নেতা নহেন, তিনি আধ্যাত্মিক জীবনেরও নেতা। এই আদর্শ দেশের প্রত্যেককে গ্রহণ করিতে হইবে। ওলামারা একবাক্যে ইহা স্বীকার করিতে পারিলেন না, আবার সরাসরি বাতিল করিতেও পারিলেন না। তাঁহারা একটা নূতন চাল চালিলেন। আবুল ফজলের পিতা মোল্লা মোবারকের প্রস্তাবক্রমে একটা ফতোয়া লিখিত হইল। তাহার মর্ম্ম এইরূপ :—যেহেতু রাজা সুবিচারক ও সুশাসক, সেই হেতু তিনি একজন 'মুজাদ্দেদ্' (সংস্কারক)। সুতরাং তিনি ধর্ম্মের ব্যাপারে নির্ভরযোগ্য অথরিটি।

মোল্লা মোবারক সর্ব্বপ্রথমে এই ফতোয়া স্বাক্ষর করিলেন ও অন্যান্য ওলামাদেরকে স্বাক্ষর করিতে বলিলেন। আগ্রা, জৌনপুর ও আরও কয়েকটি স্থানের ওলামাগণ ইহাতে স্বাক্ষর করিলেন। তারপর দিল্লীর ওলামাগণকে স্বাক্ষর করিতে বলা হইল। কিন্তু শেখ জামালুদ্দিন তাহা স্বাক্ষর করিতে অস্বীকার করিলেন, এবং দৃঢ়ভাবে বলিলেন, আমি এরূপভাবে রাজার হাতে সমস্ত ক্ষমতা ছাড়িয়া দিতে পারি না। তাঁহার দেখাদেখি আরও দুচারজন ওলামা স্বাক্ষর করিলেন না। ইহার পর তাঁহার উপর রাজরোষ পতিত হইল। তিনি ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিয়া মক্কা চলিয়া গেলেন। মওলানা আজাদ এই মহাপুরুষের একাদশ অধস্তন বংশধর। তাঁহার পরিবারের অনেকেই পণ্ডিত ও সুফী-মতবাদের শিক্ষাগুরু ছিলেন। তাঁহারা কখনও সরকারী চাকরী গ্রহণ করেন নাই, অথবা রাজকীয় অনুগ্রহ-ভিখারী হন নাই। মওলানা আজাদ সাহেবের

আর একজন পূর্ব্বপুরুষ সম্রাট জাহাঙ্গীরের সময় প্রতিষ্ঠালাভ করেন। তাঁহার নাম শেখ মহম্মদ। সে যুগে কেহ কেহ সম্রাটের দরবারে হাজির হইবার সময় শির নত করিয়া কুর্নিশ করিত। বহু ওলামা তাহা করিতে বাধ্য হইতেন। কিন্তু মওলানা আজাদ সাহেবের পূর্ব্বপুরুষ শেখ মহম্মদ তাহাতে সম্মত হন নাই। তিনি এই প্রথার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন যে, এই প্রকার কুর্নিশ কেবল খোদাতালার প্রাপ্য। কোন মানুষ বা রাজা তাহা পাইতে পারে না। সম্রাট জাহাঙ্গীর তাঁহার তেজস্বিতা সহ্য করিতে পারিলেন না। তাঁহাকে এই জন্য চারি বৎসর গোয়ালিয়ারের জেলে বন্দী করিয়া রাখা হইয়াছিল।

মওলানা আজাদ সাহেব পূর্ব্বপুরুষ হইতেই বিপ্লবী ভাব উত্তরাধিকার-সূত্রে পাইয়াছিলেন। বহু যুগ ধরিয়া এই প্রকার গৌরবান্বিত আদর্শের উপর মওলানা আজাদের পরিবারবর্গ দাঁড়াইয়া আছেন। মওলানার পূর্ব্বপুরুষগণ কখনও সরকারী চাকরী গ্রহণ করেন নাই। তবে তাঁহার প্রপিতামহ শেখ সিরাজুদ্দিন এই নীতি প্রথম ভঙ্গ করেন। তিনি তদানীন্তন সরকারের অধীনে প্রধান বিচারপতি পদে বরিত হইয়াছিলেন। তাঁহার পরে আরও অনেকে চাকরী গ্রহণ করিয়াছিলেন। মওলানার পিতামহ একটা চাকরী গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার পর আর কেহ চাকরী করেন নাই। গৌরবান্বিত পূর্ব্বপুরুষ ও প্রাচীন অভিজাত বংশে জন্মলাভ করার যে গর্ব্ব ও শ্লাঘা থাকা সম্ভব, তাহা আমাদের মওলানার আছে। তাঁহার ধমনীতে একই রক্ত প্রবাহিত। তিনি একদিকে পূর্ব্বপুরুষগণের বহু লোককে ছাড়াইয়া গিয়াছেন। বিচক্ষণ বুদ্ধি, অনন্যসাধারণ প্রতিভা ও সুমার্জ্জিত শিক্ষালাভ করিয়াও তিনি কখনও

গুরুগিরি করেন নাই, অথবা শিষ্য সংগ্রহ করেন নাই। কিন্তু তাঁহার পিতা ও পূর্ব্বপুরুষগণ অগণ্য শিষ্যের গুরু ছিলেন। মওলানার এমন একটা সংযত ভাব আছে, বুদ্ধিদীপ্ত প্রতিভার এমন একটা ঝলক আছে যাহার জন্য তিনি সকলের সঙ্গে মিশিতে পারেন না। অনেকের নিকট ইহা অহঙ্কার বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু তিনি অহঙ্কারী নহেন, বিনয় তাঁহার যথেষ্ট আছে। তিনি সাধারণতঃ নির্জ্জনে আপনার গ্রন্থ ও সাধনা লইয়া সময় কাটাইয়া থাকেন। তিনি নিজেই তাঁহার শিষ্য ও ছাত্র—আর ইহাতেই তিনি সন্তুষ্ট।

মওলানা আজাদ সাহেবের পিতা মওলানা খায়রুদ্দিন স্বীয় জীবনে পূর্ব্বপুরুষ জামালুদ্দিনের প্রাচীন আদর্শ রক্ষা করিয়া চলিতেন। তাঁহারই মত তিনি একাধারে পণ্ডিত ও স্থফী ছিলেন। তিনি আরবী ও ফারসী ভাষায় বহু মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবন ও কর্ম্মনীতি আধ্যাত্ম-চিন্তায় কাটিত। সরল ও সহজভাবে স্থফীদের মতই তিনি জীবন যাপন করিতেন। তাঁহার সহস্র সহস্র শিষ্য ছিল। দিল্লী, গুজরাট, কাটিয়ার, বোম্বাই এবং কলিকাতায় তাঁহার অখণ্ড প্রভাব ছিল। তিনি অনায়াসে দিল্লীতে শিষ্য ও সাধনা লইয়া স্থফী-জীবন যাপন করিতে পারিতেন এবং পূর্ব্ব-পুরুষগণের মহৎ বৃত্তি অনুসরণ করিয়া চলিতে পারিতেন। কিন্তু এই সজ্জন ও মহৎ ব্যক্তি সিপাহী বিপ্লবের দুর্যোগপূর্ণ দিনে নিরুপদ্রবভাবে থাকিতে পারিলেন না। ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিপ্লবের ফলে দিল্লীতে অত্যাচার ও অনাচারের কালছায়া বিস্তৃত হইয়া পড়িল। বিপ্লবীদেরকে দমন করিবার জন্য কোম্পানীর সৈন্যগণ সর্ব্বত্র অত্যাচার করিতে লাগিল। আবালবৃদ্ধবনিতা-নির্ব্বিশেষে সর্ব্বত্র তাহারা অত্যাচার ও হত্যালীলার তাণ্ডব

নৃত্য আরম্ভ করিল। হয়ত মওলানা খায়রুদ্দিন ইহাদের কবলে পড়িয়া অকালে প্রাণ হারাইতেন। কিন্তু তাঁহার এক অকৃত্রিম বন্ধুর সাহায্যে তিনি ভারত পরিত্যাগ করিয়া পবিত্র মক্কা নগরীতে আশ্রয় লইয়া রক্ষা পাইলেন। সে যুগে ইসলাম জগতের খলিফা ছিলেন সুলতান আবদুল মজিদ। খলিফা পূর্ব্ব হইতে মওলানা খায়রুদ্দিনের বিদ্যাবত্তা ও আধ্যাত্ম সাধনার পরিচয় পাইয়াছিলেন। তিনি তাঁহাকে কনস্টাণ্টিনোপলে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। এই সময় তাঁহার অনেক গ্রন্থ কায়রোতে প্রকাশিত হইয়াছিল। তিনি সেখানে খলিফার দরবারে বেশী দিন থাকিলেন না, অবিলম্বে মক্কায় প্রত্যাগমন করিলেন। সেই সময় মক্কার সুপ্রসিদ্ধ 'নহ্‌রে-জোবেয়দা' (জোবেয়দার খাল) সংস্কার অভাবে অব্যবহার্য্য হইয়া পড়িয়াছিল। মওলানা খায়রুদ্দিন সাহেব তাহা সংস্কারের জন্য কয়েক লক্ষ টাকা তুলিয়া দিলেন। মক্কাতে অবস্থিতিকালে তথাকার বিখ্যাত পণ্ডিত শেখ মহম্মদ জহির ইত্‌রীর বিদুষী কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। ইহারই গর্ভে আবুল কালাম আজাদ জন্মগ্রহণ করেন। পিতা ও মাতা উভয়দিক হইতে তিনি যেন উত্তরাধিকারসূত্রে পাণ্ডিত্য ও মনীষা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

ইহার কিছুদিন পর ভারতবর্ষ হইতে বহু শিষ্য মক্কাধামে হজ করিতে গিয়া মওলানার পিতাকে স্বদেশে চলিয়া আসিতে অনুরোধ করিলেন। তাহাদের অনুরোধ উপেক্ষা করিতে না পারিয়া তিনি ১৮৮০ সালে ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু মক্কার সহিত সংশ্রব একেবারে বিচ্ছিন্ন করেন নাই। ১৮৮০ হইতে ১৮৯২ এর মধ্যে তিনি কয়েকবারই মক্কা গিয়াছিলেন। এই সময় ১৮৮৮ সালে মওলানা আবুল কালাম মক্কা নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন।

বাল্যাবস্থায় মওলানা আবুল কালাম আরব দেশেই কাটাইয়াছিলেন এবং সেইখানেই প্রাথমিক শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। ১৮৯৮ সালে তিনি পিতার সহিত কলিকাতা আসেন এবং স্থায়ীভাবে বাস করিতে লাগিলেন। আরব-মাতার নিকট পালিত হইয়াছিলেন বলিয়া বাল্যাবস্থায় আরবীই ছিল তাঁহার মাতৃভাষা। তাঁহার মাতা অন্য কোন ভাষা জানিতেন না। পরে তিনি পিতার নিকট উর্দু ও ফারসী শিখিয়াছিলেন। কলিকাতা আসিবার সময় এই তিন ভাষা তিনি আয়ত্ত করিয়াছিলেন। এখানে তাঁহাকে কোন স্কুল বা মাদ্রাসায় পাঠান হয় নাই। পিতার নিকট ও পিতার বন্ধু স্থানীয় আলেম-গণের নিকট তিনি অনেক বিষয় শিখিয়াছিলেন। বাল্যকাল হইতেই পাঠে তাহার উন্নতি অসম্ভবরূপে হইয়াছিল। "দার্সে নেজামিয়া" হইতেছে মাদ্রাসা শিক্ষার একটা পরিপূর্ণ পাঠ। আরবী ফারসী, ভাষাতত্ত্ব, দর্শন, তর্কশাস্ত্র, গণিত, ভূগোল ও ইতিহাস—এই কয়েকটি বিষয় এই পাঠ-ব্যবস্থার অন্তর্গত। সাধারণ ছাত্র চৌদ্দ ও পনর বৎসরের কম সময়ে ইহা শেষ করিতে পারে না। আর যাহারা মেধাবী তাহারা দশ বৎসরে ইহা সমাপ্ত করে। আবুল কালামের প্রতিভা কত তীক্ষ্ণ ছিল তাহা এই ঘটনা হইতে বুঝা যাইবে যে, এই ধরণের কঠিন পাঠ তিনি মাত্র চারি বৎসরে শেষ করেন। অবশ্য পাঠ লইবার পূর্ব্বে আরবী ও ফারসীতে তাঁহার ভিত্তি সুদৃঢ় হইয়াছিল। পাঠ্যাবস্থাতেই তিনি অপরকে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। শিক্ষকতা করাও উক্ত 'দারসে নেজামিয়ার' অন্তর্গত ছিল। ছাত্রগণ যাবৎ পঠিত বিষয় অন্য ছাত্রকে সুচারুরূপে পড়াইতে না পারিত, তাবৎ তাহাদিগকে 'আলিম' বলা হইত না, অথবা 'দারসে

নেজোমিয়ায়' সনদ দেওয়া হইত না। বালক আবুল কালাম চৌদ্দ বৎসর বয়সে ছাত্র-শিক্ষক হইয়াছিলেন। তাঁহাকে এই বয়সে কতকগুলি ছাত্রকে পাঠ দিতে হইত এবং বিষয়টি বুঝাইতে হইত। তবেই তিনি সনদ পাইয়াছিলেন। এই সব উপছাত্রদের মধ্যে একটি পরিণত বয়সের ছাত্র তাঁহার নিকট পাঠ লইত। সে ছিল জাতিতে পাঠান। তাহার প্রলম্বিত শ্মশ্রু, দীর্ঘ দেহ দেখিয়া মনে হইত সে না জানি কতই পণ্ডিত। কিন্তু বুদ্ধি ছিল তাহার একটু মোটা ধরণের। তাহাকে পড়াইবার ভার পড়িল আবুল কালামের উপর। তাহার মোটা বুদ্ধি দেখিয়া মাঝে মাঝে মওলানার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিত। দিনের পর দিন তিনি তাহাকে 'কেয়াস' (deductive), ও 'ইস্‌তাকরা' (inductive) যুক্তিধারার পার্থক্য বুঝাইয়া চলিতেন। কিন্তু সে তাহা কিছুতেই বুঝিতে পারিত না। একদিন ধৈর্য্য হারাইয়া আবুল কালাম তাহার মুখের উপর পুস্তকখানি ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন এবং ক্রোধভরে বলিলেন, "তোমার কিছুই হইবে না, তুমি ঘাস খাওগে।" পাঠান কোন কথা না বলিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেল এবং সারাদিন কিছুই আহার করিল না। তাঁহার পিতা এই ঘটনা জানিতে পারিয়া আবুল কালামকে ভর্ৎসনা করিলেন এবং বলিলেন, এ লোকটি তোমার পিতার বয়সের, কেন তুমি তাহার প্রতি এই প্রকার দুর্ব্যবহার করিলে? যাও তাহার নিকট ক্ষমা চাহিয়া লও এবং তাহাকে খাইতে অনুরোধ কর।" কিন্তু পাঠানটি এমন ব্যবহার করিল যেন মনে হইল কিছুই হয় নাই। সে আবুল কালামকে বলিল, "আপনি হইতেছেন আমার গুরু, আর আমি আপনার শিষ্য, আমাকে দণ্ড দিবার অধিকার আপনার আছে। আমার

নিকট ক্ষমা চাহিবার কোন কারণ নাই।" তাহার এই ব্যবহারে আবুল কালাম আরও লজ্জিত হইলেন এবং তিনি তাহাকে না খাওইয়া ছাড়িলেন না।

তিনি কিছুদিন ধরিয়া পিতার নিকট থাকিয়া অন্যান্য জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। তাহার স্বভাব, চরিত্র, বংশসুলভ বিনয়, নম্রতা ও আচার-ব্যবহার সবই তিনি পিতার নিকট লাভ করেন। বাল্যকালই চরিত্র গঠনের সময়। আর এই বাল্যকালে তাঁহার প্রধান সঙ্গী ও শিক্ষক ছিলেন তাহার পিতা। তাঁহার পিতা একাকী থাকিতে ভালবাসিতেন। তাঁহার হাজার হাজার শিষ্য তাঁহাকে দেখিতে আসিত। কিন্তু তিনি নির্জ্জনতা ভালবাসিতেন বলিয়া বেশীক্ষণ কাহারও সহিত গোশগল্প করিতেন না এবং সহজে কাহারও নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতেন না, বা কাহারও বাটি যাইতেন না। তবে "মিলাদ শরীফে"র নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিতেন না এবং ঈদের দিনে দুচারজন অন্তরঙ্গ শিষ্যের বাটি যাইতেন। তাহার গৃহে প্রত্যেক বিষয়ে চরমতম সরলতা ও আড়ম্বরহীনতা সততঃ বিরাজমান থাকিত। নবযুগের প্রভাবে তিনি কখনও আক্রান্ত হন নাই। পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রতি তিনি ঘৃণার ভাব পোষণ করিতেন। অথচ তাহার মধ্যে কোনওরূপ ধর্ম্মান্ধতা ছিল না। গৃহে সামান্য ধরণের আসবাবপত্র থাকিত। মেঝেতে মাদুর পাতা থাকিত, তাহারই উপর ধনী-দরিদ্র, উচ্চ নীচ, নিমন্ত্রিত ও অভ্যাগত ব্যক্তিগণ উপবেশন করিতেন। আগন্তুকদের মধ্যে বড় বড় নবাব, রাজাও ছিলেন। টিপু সুলতানের পুত্র মাঝে মাঝে তাঁহার নিকট আসিতেন। তাঁহার পোষাক-পরিচ্ছদ অতি সাদাসিধে ধরণের ছিল। তিনি বোতামওয়ালা কোট কখনও

পবিধান কবেন নাই। পুত্র আবুল কালামকে তিনি এইভাবে মানুষ কবিয়াছিলেন। আব সেই জন্য তিনি তাঁহাকে কোনও ইংরেজি স্কুলে পড়িতে দেন নাই। গৃহে 'দাবসে নেজামিযাব' পাঠ শেষ কবাইয়া তিনি আবুল কালামকে ১৯০৫ সালে আলেম হইবাব জন্য মিশবেব আল আজহাব বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেবণ কবেন। সেখানে দুই বৎসব পড়িয়া ১৯০৭ সালে তিনি ভাবতে প্রত্যাগমন করেন। মিশবে অবস্থিতিকালে তিনি বহু বিপ্লবী নেতাব সহিত পবিচিত হইয়াছিলেন। মসলিম জগতেব উপব ইউবোপীয় সাম্রাজ্যবাদ কি ভাবে প্রভাব বিস্তার কবিতেছিল, তাহা তিনি স্বচক্ষে দেখিয়াছেন। সেই জন্য ভারতে আসিয়া অন্যান্য মুসলিম নেতাদেব সহিত একমত হইতে পাবেন নাই। তাঁহাব ভাবত প্রত্যাগমনেব দুই বৎসব পরে, অর্থাৎ ১৯০৯ সালে তাঁহাব পিতা কলিকাতায় পবলোকগমন কবেন। তাহাব পব তিনি স্বাধীনভাবে জ্ঞানালোচনা কবিতে লাগিলেন। এই সময়ে তাঁহার এক বন্ধুর উৎসাহে ইংবেজি পড়িতে লাগিলেন। এ বিষয়ে তাঁহাব প্রধান সহায়ক হইল একখানি ব্যাকবণ ও অভিধান। এইভাবে তিনি অল্প দিনেব মধ্যে ইংবেজি ভাষা শিখিয়া ফেলিলেন। তাঁহাব পিতাব বহু হিন্দু শিষ্য ছিল। তাঁহাবা তাঁহাকে ধর্ম্মবিষয়ে নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কবিতেন। আর তিনি জলেব মত সে সবেব উত্তব দিয়া যাইতেন। এমন পিতাব সুযোগ্য পুত্র যে আজীবন হিন্দু-মুসলিম মৈত্রীব জন্য চেষ্টা কবিবেন, তাহাতে আশ্চর্য্য হইবাব কিছুই নাই।

প্রতিভার উন্মেষ

মওলানা আজাদ অসীম প্রতিভা লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি কোনও দিন প্রতিভার অপপ্রয়োগ করেন নাই। দেশ, জাতি ও সমাজের কল্যাণের জন্য তিনি তাঁহার সমগ্র জীবন উৎসর্গ করিলেন। তিনি কোন দিন সখের রাজনীতি করেন নাই। প্রথম হইতে আজ পর্য্যন্ত একটা আদর্শকে কেন্দ্র করিয়া তাঁহার অপূর্ব্ব প্রতিভা ও শক্তি বিকশিত হইয়াছে। তাঁহার পিতা একজন স্বনামধন্য 'পীর' (দীক্ষাগুরু) ছিলেন। পিতার চরণতলে বসিয়া তিনি তাঁহারই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া পৌরোহিত্য বৃত্তি গ্রহণ করিতে পারিতেন। প্রতিভা ও ত্যাগের বলে তিনি পিতার ন্যায় গণ্যমান্য 'পীর' হইতে পারিতেন। এ পথ তাঁহার জন্য মুক্ত ছিল। কিন্তু তিনি সে দিকে গেলেন না। তাহার জ্ঞানগরিমা, শিক্ষাদীক্ষা ও সমাজের জন্য বেদনাবোধ এত প্রবল ছিল যে, তিনি 'পীরের' জীবনকে তাঁহার আদর্শ সিদ্ধির পথে সহায়ক বলিয়া মনে করিলেন না। এ পৌরোহিত্য-জীবনে তিনি সন্তোষলাভ করিলেন না। দেশের ও সমাজের কল্যাণের উদ্দেশ্যে অন্য পথ বাছিয়া লইলেন। তিনি দেখিলেন, ভারতের মুসলিম সুধিগণ বহির্জ্জগতের বিশেষতঃ নিকট-প্রাচ্যের মুসলিম রাষ্ট্রের কোন সংবাদ রাখেন না, বা রাখিতে চাহেন না। তাহার প্রথম কাজ হইল বহির্জ্জগতের সহিত সাক্ষাৎ সংযোগ স্থাপন করা। এতদুদ্দেশ্যে তিনি এই ধরণের নানা গ্রন্থ ও সাময়িক পত্রিকা সংগ্রহ করিয়া দিনের পর দিন কাটাইয়া দিলেন। তখন যে সব বিষয়

বহির্জ্জগতে আলোচিত হইয়াছিল, নিকট-প্রাচ্যের উপর ইউরোপীয় সাম্রাজ্য-বাদ যে সব ষড়যন্ত্র জাল বিস্তার করিতেছিল, তৎসমুদয় সম্যকরূপে অবগত হইলেন। লিখিবার প্রবৃত্তি তাঁহার শৈশব হইতেই ছিল। এক্ষণে লেখনীর সাহায্যে তিনি তাঁহার অভিজ্ঞতালব্ধ ভাবধারা প্রচার করিতে মনস্থ করিলেন। বাল্যকালেই তিনি কতকগুলি সাময়িকপত্রে বহু প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন এবং কয়েকটি ছোট ছোট পত্রিকার সম্পাদকতা করিয়াছিলেন। স্বাধীন-ভাবে নিজের আদর্শ প্রচার করিবার জন্য তিনি "লিসানুল-সিদ্‌ক" নাম দিয়া একটি পত্রিকা প্রকাশ করিলেন। তখন তাঁহার বয়স মাত্র চৌদ্দ বৎসর। এই অল্প বয়সে কোন বিষয় যেন তাঁহার বোধাতীত ছিল না। কঠোর সত্যকে স্পষ্টভাবে বলিবার মত সাহস তাহার মত আর কাহারও ছিল না। সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি ও সমালোচনা এই কয়েকটি বিষয় উক্ত পত্রিকায় আলোচিত হইত। মওলানা আবুল কালামকে ব্যক্তিগত-ভাবে তখন কেহ জানিত না। কিন্তু তাঁহার লেখা পড়িয়া সকলে মনে করিত একজন যুগপ্রবর্ত্তক আবির্ভূত হইয়াছেন। তিনি প্রত্যেক বিষয়ে আলোকপাত করিতে চেষ্টা করিতেন। তৎকালের প্রসিদ্ধ লেখকদের পুস্তকের নির্ভীক সমালোচনা করিতেন। এই সময় মুসলিম ভারতে কবি আলতাফ হোসেন হালি অসীম প্রভাব বিস্তার করিতেছিলেন। হালি স্যার সৈয়দ আহমদের একখানা জীবনী প্রণয়ন করেন। মওলানা আজাদ তাঁহার "লিসানুল্‌-সিদ্‌কে" এই গ্রন্থের একটি সুচিন্তিত সমালোচনা করেন। এই সমালোচনা পশ্চিমা-ঞ্চলের বহু মুসলিম সুধীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কিন্তু তখন পর্য্যন্ত কোন মুসলিম পণ্ডিত এই বালকের সহিত পরিচিত হইবার সুযোগ পান নাই।

এই সময় তিনি লাহোরে একটি পণ্ডিতদের সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তৃতা করিবার নিমন্ত্রণ পাইলেন। ইতিপূর্ব্বে তিনি ছোট ছোট সভায় বক্তৃতা করিয়াছেন। কিন্তু লাহোরের বিদ্বজ্জনের এই সভায় বক্তৃতা দিবার অবসর তাঁহার পক্ষে ছিল এক অচিন্তনীয় ব্যাপার। লাহোরের "আন্‌জুমনে হিমাযেতে ইস্‌লাম" নামক সমিতি "লিসানুল্-সিদ্‌কের" সম্পাদককে ১৯০৪ সালে তাহাদের বাৎসরিক সভায় প্রধান অভিভাষণ দিবার জন্য আহ্বান করিল। কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাকে ইতিপূর্ব্বে কখনও দেখেন নাই। কেবল জানিতেন যে, তিনি একজন যুগান্ত-কারী লেখক। এই সভায় অনেক বড় বড় পণ্ডিত উপস্থিত ছিলেন—কবি হালি, কবি নজির আহ্‌মদ্, কবি ইকবাল প্রমুখ কবিগণও ছিলেন। তা ছাড়া নানা অঞ্চল হইতে বহু শিক্ষিত ও গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। বক্তৃতার বিষয় ছিল—The rational basis of religion। কেহ ভাবিতে পারেন নাই যে, এই কঠিন বিষয়ে বক্তৃতা করিবার জন্য ষোল সতের বৎসরের এক বালক 'আন্‌জুমনের' নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে সাহস করিবে। যখন কবি হালির সহিত তাঁহার পরিচয় করান হইল, তখন তিনি মনে করিলেন—এই বালক আবুল কালামের পুত্র। কিন্তু তাঁহার আশ্চর্য্যের সীমা রহিল না, যখন বুঝিলেন যে, এই বালক নিজেই আবুল কালাম—এই ছেলেটি 'লিসানুল-সিদ্‌কের' সম্পাদক। অতঃপর তাঁহাকে বক্তৃতা দিবার জন্য আহ্বান করা হইল। তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া সমস্ত শ্রোতৃমণ্ডলী চমৎকৃত হইয়া গেল। কি বাগ্মিতায়, কি যুক্তিতর্কের দিক দিয়া, কি বিষয়বস্তুর গুরুত্বের দিক দিয়া, কি প্রাঞ্জলতায়, তাঁহার তিন ঘণ্টাব্যাপী বক্তৃতা সকলকে

স্তম্ভিত করিয়া দিল। তাহারা বুঝিলেন, ভারতে একজন প্রতিভাশালী মানুষ আসিতেছেন। কবি হালি রহস্য করিয়া বলিলেন: An old head on young shoulders"

এই ঘটনারও কিছু আগেকার কথা। তখন তাঁহার বয়স চৌদ্দ বৎসর। মাঝে মাঝে তিনি কবিতা লিখিয়া অবসর বিনোদন করিতেন। "নেরাঙ্গে আলাম" নামক একটি কবিতার পত্রিকায় বহু কবিতা প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার নামের শেষে 'আজাদ' শব্দটি হইতেছে তাহার কবি-নাম। উর্দ্দু কবিগণের মধ্যে একটা রীতি আছে যে, তাঁহারা মধ্যে মধ্যে একত্র হইয়া কবিতার প্রতিযোগিতা করিতেন। ইহাকে বলে "মুশায়েরা" অর্থাৎ কবিতা-যুদ্ধ। একজন কবি কবিতার একটি পদ বলিতেন, আর সঙ্গে সঙ্গে অন্য কবিগণ একের পর এক পরবর্তী পদগুলি পূরণ করিতেন। ইহার আরবী নাম "মুশাএরা"। আবুল কালাম এই বয়সে এই সব কবিতা প্রতিযোগিতায় যোগদান করিতেন এবং সঙ্গে সঙ্গে রচনা করিয়া কবিতার পদ পূরণ করিতেন। বালকের অদ্ভুত কবিত্ব জ্ঞান দেখিয়া কবিগণ মুগ্ধ হইয়া যাইতেন। বিখ্যাত উর্দ্দু কবি গালেবের শিষ্য নাদির খাঁ আবুল কালামের কবিতা শুনিয়া মনে করিতেন, বোধ হয় এই বালক অপরের কবিতা মুখস্থ করিয়া আবৃত্তি করিতেছে। তিনি পরীক্ষা করিবার জন্য কঠিন কঠিন কবিতা রচনা করিয়া আবুল কালামের সম্মুখে উপস্থিত করিতেন, আর আবুল কালাম সঙ্গে সঙ্গে তাহার পদ পূরণ করিয়া দিতেন। ইহাতেও তাঁহার সন্দেহ ঘুচিল না। পরে একদিন আবুল কালামকে একাকী পাইয়া ধরিয়া বসিলেন এবং বলিলেন, "বালক। তুমি ত 'মুশাএরাতে' শ্লোকের পর শ্লোক বলিয়া যাও, এইবার

আমার এই শ্লোকটির পাদ পূরণ করিয়া দাও।" এই বলিয়া এই শ্লোকটি উচ্চারণ করিলেন :—

ٹاد نہو ۔ شاد نہو ۔ آباد نہو—

"ইয়াদ্ না হো, শাদ্ না হো, আবাদ্ না হো"

তার সঙ্গে সঙ্গে আবুল কালাম শ্লোকের পর শ্লোক বলিয়া যাইতে লাগিলেন। তখন নাদির খাঁ আনন্দে অধীর হইয়া তাঁহাকে বুকে জড়াইয়া ধরিলেন এবং বলিলেন : "তুমি আমার অপেক্ষাও ভাল কবি।"

এইভাবে আবুল কালাম সর্ব্বত্র নিজের প্রতিভার পরিচয় দিতে লাগিলেন এবং চারিদিক হইতে অজস্র প্রশংসা কুড়াইতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি ইহাতে সন্তুষ্ট থাকিতে পারিলেন না। ইহা মানুষের জীবন নহে। মহৎ যাহার ব্রত, যুগান্তকারী পরিবর্ত্তন যে আনিতে চায়, সে এইভাবে অলস জীবনযাপন করিতে পারে না। আবুল কালাম আর বৃথা সময় কাটাইতে পারিলেন না। পথ বাছিয়া লইবার জন্য অস্থির হইয়া উঠিলেন। তাঁহার অনুসন্ধিৎসা প্রবৃত্তি উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলিল। নানা প্রশ্ন মনে জাগিল। কোন্ পথে যাওয়া তাহার উচিত, কোন্ ব্রত অবলম্বন করিলে জগতকে কিছু দান করিতে পারিবেন—এই হইল তাহার চিন্তা। তিনি ১৯০৫ হইতে ১৯০৭ সাল পর্য্যন্ত সিরিয়া, মিশর ও আরব প্রভৃতি অঞ্চল ঘুরিয়া নানা অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। এই সব প্রদেশ ভ্রমণের পর তাঁহার জিজ্ঞাসার প্রবৃত্তি আরও বৃদ্ধি পাইল। ভ্রমণের পর স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া দেখিলেন, দেশে বিপ্লবের আগুন জ্বলিয়াছে। নূতন নূতন দাবী, প্রগতিমূলক আদর্শ, নব নব স্বপ্ন জাতির ঘুমন্ত প্রাণকে জাগাইয়া তুলিয়াছে। তাঁহার দূরদৃষ্টির প্রভাবে

বুঝিলেন, দেশে একটি বিরাট আন্দোলন আসিতেছে, তাহাকে প্রতিরোধ করা কাহারও সাধ্য নাই। এই আন্দোলন দেশের সর্ব্বত্র আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎগারের মত একটা তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করিবে। যাহারা ইহা হইতে সরিয়া থাকিবে, তাহাদের মৃত্যু সুনিশ্চিত। তাই আবুল কালাম স্থির করিলেন, তাঁহার সমস্ত শক্তি দিয়া এই আন্দোলনকে সাহায্য করিবেন, তাঁহার যাহা দিবার তাহা তিনি দিতে কাতর হইবেন না। এই উদ্দেশ্যে নানা দলের লোকের সহিত আলাপ আলোচনা করিলেন। বাঙলার সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের সহিত সাক্ষাৎভাবে যোগাযোগ স্থাপন করিলেন। সরকারের সি আই ডি বিভাগ বুঝিল একজন প্রচণ্ড বিপ্লবী মানুষ কর্ম্মক্ষেত্রে ঝাঁপ দিতে উদ্যত। তাহারা গোপনে আবুল কালামের গতিবিধি লক্ষ্য করিতে লাগিল। তিনি সাধারণভাবে যেমন দেশের কথা ভাবিয়াছিলেন, সেইরূপ বিশেষভাবে ভারতে ইসলামের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে গভীরভাবে চিন্তা করিয়াছিলেন। কি ভাবে মুসলমানের উন্নতি হইতে পারে, তাহা তাঁহার চিন্তার বিষয় হইল। সার সৈয়দ আহমদের প্রভাবে মুসলমান যুবক রাজনীতিতে প্রতিক্রিয়াশীল হইয়া উঠিতেছিল। মওলানা আবুল কালাম তাহাদের মনে রাজনৈতিক চেতনা আনয়ন করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। ধর্ম্মের প্রগতিমূলক ব্যাখ্যা, আর রাজনীতিতে বিপ্লবী আদর্শ প্রচার—এই দুইটি ব্রত অবলম্বন করিয়া মওলানা আবুল কালাম কর্ম্মক্ষেত্রে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন।

"আল্ হেলালের" জন্ম

মওলানা আবুল কালাম মিশব হইতে স্বদেশ প্রত্যাগমন কবিয়া দেখিলেন যে, সাব সৈয়দ আহ মদেব প্রভাবেব ফলে সমগ্র মুসলমান সমাজে ব্রিটিশ-ভক্তিব বান ডাকিতেছে। বিদেশী শাসনকে তাহাবা বিধাতাব আশীর্ব্বাদ বলিযা গ্রহণ কবিতে শিখিয়াছে। আব তাহাদেবকে জাতীয় আন্দোলন হইতে বিচ্ছিন্ন কবিবাব জন্য ভেদনীতি সফলতাব মধ্যে ক্রিয়া কবিতেছে। একদিকে জাতীয়তাবাদী হিন্দুগণ নানাভাবে ও নানাবিধ প্রতিষ্ঠানেব মধ্য দিযা দেশেব মুক্তিব জন্য সংগ্রাম কবিতেছে, আব অন্যদিকে মুসলমানেব বড বড নেতাগণ ব্রিটিশ ভক্তিব পবাকাষ্ঠা দেখাইতেছেন। মুসলিম যুবকগণ মনে প্রাণে, দেহে আত্মায, নিজেদেব দাসত্বকে মঙ্গলকব বলিয়া ববণ কবিয়া লইতেছে। মওলানা আজাদ স্থিব কবিলেন, তাঁহাব সমস্ত শক্তি ও সাধনা দিয়া মুসলমানেব এই দাস মনোভাবেব পবিবর্ত্তন সাধন কবিবেন। পুরুষানুক্রমে তাঁহাব ধমনীতে, বক্তেব প্রতি বিন্দুতে বিদ্রোহ ও বিপ্লবেব বীজ প্রবাহিত হইতেছিল। তাঁহাব পিতা স্বচক্ষে সিপাহী বিপ্লবেব সমস্ত ঘটনা নিবীক্ষণ কবিযাছিলেন। ইহাব ফলে তিনি পাশ্চাত্য সভ্যতাব প্রত্যেক বস্তুকে অন্তবেব সহিত ঘৃণা কবিতেন। মওলানা আজাদ পিতাব পদতলে অন্যান্য শিক্ষাব সহিত এই বিদ্রোহভাবও শিখিয়াছিলেন। একথা সত্য যে, সাব সৈয়দ আহমদ্ ধর্ম্মসংস্কাব বিষয়ে মুসলমান সমাজেব অনেক উপকার কবিয়াছিলেন। তিনি অন্ধবিশ্বাস, গোঁডামি ও মধ্যযুগীয় ভাবধাবা হইতে

মুসলমান সমাজকে মুক্ত করিবার জন্য যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি অন্যদিক দিয়া মুসলমান সমাজের মহা অনিষ্ট করিয়াছিলেন। তিনি তাহাদের রাজনৈতিক চেতনার পথে প্রবল বাধা সৃষ্টি করিয়াছিলেন। মুসলমান সমাজকে কংগ্রেসের সংস্রব পরিত্যাগ করিতে উপদেশ দিয়া তাহাদের রাজনৈতিক চেতনাবোধকে অসাড় করিয়া দিয়াছিলেন। তাহার ফলে কয়েক যুগ ধরিয়া মুসলমান সমাজ সকল প্রকার উন্নতিমূলক রাজনৈতিক আদর্শ ও জীবন্ত কর্মধারা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। দেশের সাধারণ আন্দোলন হইতে তাহাদের নাড়ীর যোগ কাটিয়া গিয়াছিল। বস্তুতঃ, সার সৈয়দ আহমদ্ প্রকারান্তরে ভারতের রাজনৈতিক মুক্তির পথে বাধা সৃষ্টি করিয়াছিলেন; মুসলমান সমাজের মজ্জায় মজ্জায় ব্রিটিশ-প্রীতির ভাব প্রবেশ করাইয়াছিলেন। জাতীয় সম্মান, সুউচ্চ মন, স্বাধীনতার জন্য আগ্রহ ও রাজনৈতিক দূরদর্শিতার পরিবর্তে তিনি জাগাইয়া দিয়াছিলেন পরাজয়ের মনোভাব, দাসত্বে আত্মশ্লাঘার ভাব, স্বাধীনতার প্রতি প্রবল বিতৃষ্ণা। আমরা স্বীকার করি যে, সার সৈয়দ আহ্মদ ইচ্ছা করিয়া এসব করেন নাই। কিন্তু এই সব করিয়া তিনি ভুল করিয়াছেন তাহা তিনি বুঝিতে পারেন নাই। সরকারের অনুগত এজেন্ট ব্যতীত আর কেহ যে এরূপ করিতে পারে না, তাহাও তিনি বুঝিতে পারেন নাই। সার সৈয়দ আহমদের ভুলের সংশোধন করিবার ভার লইলেন মওলানা আবুল কালাম আজাদ।

মওলানা আজাদ আলিগড় দলের স্রোতে ভাসিয়া গেলেন না। তিনি স্থির করিলেন, আলিগড় দলের এই মনোভাব দূর করিবার জন্য সমস্ত শক্তি

প্রয়োগ করিবেন। ১৯০৮ সালে তাঁহার বয়স মাত্র কুড়ি বৎসর। তাঁহার অন্তরে এক অদ্ভুত সাহসের উদয় হইল। তাঁহার কর্ম্মপন্থা একটা বিপজ্জনক পথ অবলম্বন করিল। ইতিমধ্যে তাঁহার মনে এক প্রচণ্ড আলোড়ন দেখা দিল। দেশের তথা মুসলমান সমাজের রাজনৈতিক অবস্থা তাঁহার এই আলোড়নের একটা প্রধান কারণ। বাঙলা দেশই তাঁহার কর্ম্মকেন্দ্র বলিয়া বিবেচিত হইল। এই দেশকে তিনি মনে প্রাণে ভালবাসিতে লাগিলেন। আর এই বাঙলাতে জাগরণ ও চাঞ্চল্যের এক অপূর্ব্ব তরঙ্গ প্রবাহিত হইতেছিল। তিনি দেখিলেন, ভারতে দুই প্রকার রাজনীতি চলিতে পারে— বিপ্লবমূলক তথা জাতীয়তামূলক আন্দোলন, অথবা সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন। প্রথম শ্রেণীর আন্দোলনের নেতৃত্ব করিতেছিল হিন্দু যুবকগণ, আর দ্বিতীয় শ্রেণীর আন্দোলন মুসলমান সমাজকে নানা প্রলোভন দ্বারা আকর্ষণ করিতেছিল। এই শেষোক্তগণ ক্ষণিক সুবিধার মোহে সকল প্রকার রাজনৈতিক সংগ্রামের বিরুদ্ধে সরকার পক্ষের পতাকার তলে দাঁড়াইয়া আছে। যে সরকার রাজনৈতিক সংগ্রামকে দমন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছে, মুসলমান সমাজ স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া তাহাদেরই হাতের পুতুল সাজিয়া গিয়াছে। যে যুগে নব্যভারত স্বাধীনতা ও মুক্তির নামে বৈদেশিক বন্ধন দূর করিবার জন্য দেশময় আন্দোলন করিয়া বেড়াইতেছে, সে যুগে রাজভক্তির 'স্লোগান' তুলিয়া মুসলমান সমাজের নব্য যুবকগণ আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেছিল। এই বিসদৃশ দৃশ্য যুবক আবুল কালামকে মর্ম্মান্তিক পীড়া দিল। তাঁহার সহধর্ম্মিগণ সরকারের আশ্রয়ে পুষ্ট হইয়া বিশ্বের নিকট খেলার সামগ্রী হইবে, সরকারের হাতে যন্ত্রস্বরূপ ব্যবহৃত

হইবে—এ অবস্থা তিনি সহ্য করিতে পারিলেন না। মুসলমানের মানসিকতার মধ্যে বিপ্লব সাধন করিবার জন্য তাঁহার মন আকুলি বিকুলি করিতে লাগিল। কি ভাবে বিপ্লব আনা সম্ভব হইবে তাহা তিনি গভীরভাবে চিন্তা করিতে লাগিলেন। অবশেষে দ্বিবিধ কর্ম্মধারা গ্রহণ করিয়া তিনি কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। প্রথমতঃ আলিগড় দলের মানসিকতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম, দ্বিতীয়তঃ মুসলমানের অন্তর হইতে বৈদেশিক শাসনের প্রতি আনুগত্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম।

এই দ্বিবিধ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তিনি স্থির করিলেন, একটি পত্রিকা প্রচার করিবেন। ইহাই হইল "আল্ হেলালের" (অর্দ্ধচন্দ্র) উৎপত্তির মূল কারণ। ১৯১২ সালের ১৩ই জুলাই ইহার প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। তখন তাঁহার বয়স চব্বিশ বৎসর। কিন্তু ইতিমধ্যেই তিনি মুসলিম-জগৎ হইতে "মওলানা" বলিয়া অভিহিত হইতেছিলেন। পরবর্ত্তী যুগের মুক্তিকামী মওলানা মহম্মদ আলি সেই সময় রাজভক্তির জন্য আত্মশ্লাঘা অনুভব করিতেন। তাই "আল্ হেলালের" রাজনৈতিক উদ্দেশ্য দেখিয়া তিনি বিচলিত হইয়াছিলেন। কিন্তু "আল্ হেলাল" যে একটা নূতন যুগের ইঙ্গিত দিয়াছে, তাহা তিনি অস্বীকার করিতে পারেন নাই। তাঁহার সম্পাদিত "কমরেড" (Comrade) পত্রিকায় তিনি 'আল্ হেলাল' সম্বন্ধে যে সমালোচনা করিয়াছিলেন তাহা প্রণিধানযোগ্য :—"ইহা একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা। ইহার সুদক্ষ সম্পাদক মওলানা আবুল কালাম আজাদ প্রকাশের পূর্ব্বে যে পরিশ্রম ও বিপুল ব্যয় করিয়াছেন তাহা আমরা বেশ বুঝিতেছি। ইহা সংবাদপত্র জগতে এক নূতন যুগ আনয়ন করিয়াছে। ইহার বিভিন্ন

কলমে চিত্র পরিবেশন ইহার স্থায়ী বৈশিষ্ট্য। প্রাচীন ধরণের উর্দ্দু অক্ষরের পরিবর্ত্তে নূতন ধরণের আররী টাইপ ইহার আকর্ষণ আরও বাড়াইয়া দিবে। সাহিত্য, বিজ্ঞান ও মুসলিম শিক্ষা বিষয়ক আলোচনা ইহার স্থায়ী বৈশিষ্ট্য। তা ছাড়া তুরস্ক, পারস্য, মরক্কো এবং অন্যান্য মুসলিম জগতের অবস্থা রীতিমতভাবে ইহাতে থাকিবে।" মওলানা মহম্মদ আলি এই পত্রিকা সম্বন্ধে এত কথা বলিয়াছেন, কিন্তু সুকৌশলে ইহার রাজনীতি ও পলিসির কথা একেবারে পরিহার করিয়াছেন। কারণ তখন পর্য্যন্ত তিনি ব্রিটিশ ভক্ত ছিলেন। তাঁহার 'কমরেড' তখন রাজভক্তি প্রচার করিত এবং আলিগড়ের চিন্তাধারা অনুসরণ করিয়া চলিত। সেই জন্য যে কেহ রাজনীতিতে ভিন্ন মত পোষণ করিত, তাহাকে তিনি স্নেহের চক্ষে দেখিতেন না। তাই মওলানা আজাদের রাজনীতির বিরুদ্ধে তিনি তীব্র লেখনী পরিচালনা করিয়াছিলেন। কিন্তু পরে তিনিই মওলানা আজাদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে লজ্জাবোধ করেন নাই।

মওলানা আজাদ কাহারও মতামতের পরোওয়া না করিয়া এবং বন্ধু বিচ্ছেদের ভয়ে ভীত না হইয়া স্বাধীনভাবে একাকী নিজেই মুক্তির পতাকা হাতে লইয়া 'আল্ হেলাল' প্রচার করিলেন। স্বাধীন চিন্তা, নির্ভীক মনোভাব, সংস্কার ও বিপ্লব—ইহাই হইল তাঁহার পথের সম্বল। 'আল্ হেলালের' দ্বিতীয় সংখ্যায় তিনি উহার উদ্দেশ্য বর্ণনা করিলেন। উহা প্রকাশিত হইবা মাত্র মুসলিম-ভারতে বারুদের মত একটা প্রচণ্ড বিস্ফোটন সৃষ্টি করিল। তাহাদের চিন্তাধারার মধ্যে মূলগত কোন গলদ আছে কি না তাহা একবার চিন্তা করিয়া ভাবিবার জন্য 'আল্ হেলাল' সমগ্র মুসলিম সমাজকে স্তব্ধ

করিতে বাধ্য করিল। স্যার সৈয়দ আহমদ সমাজের গোড়ামী ও রক্ষণশীল মনোভাবের বিরুদ্ধে সাফল্যের সহিত সংগ্রাম করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার ব্রিটিশ-ভক্তির জন্য সমাজের মধ্যে যে রাজনৈতিক বশ্যতা ও সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতা প্রবেশ করিয়াছিল মওলানা আজাদ তাহার বিরুদ্ধে অনবরত লেখনী পরিচালনা করিতে লাগিলেন। যখন নবাব মুশতাক হোসেন প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা করিলেন :—"The sword of Islam would be always ready in the service of British raj"—যে যুগে মওলানা মহম্মদ আলি ঘোষণা করিতেন : "রাজভক্তি মুসলমানের ধর্ম্ম বিশ্বাসের অঙ্গ", আর যে যুগে আলিগড়ের পাস করা যুবকগণ নিজেদের পরাধীনতায় গর্ব্ব অনুভব করিত—সেই যুগে, মুসলিম মানসিকতার সেই নিদারুণ দিনে, যুবক আবুল কালাম ঘোষণা করিলেন : স্বাধীনতা মুসলমানের জন্মগত অধিকার। তাঁহার দুর্ব্বার লেখনীর তরবারি সমাজের দাস মনোভাবের বিরুদ্ধে অবিরাম সংগ্রাম চালাইতে লাগিল।

"আল্ হেলাল" প্রকাশিত হইবার কয়েক সপ্তাহের মধ্যে দেশের মধ্যে অসাধারণ প্রভাব বিস্তার করিল। সর্ব্বত্র একটা চাঞ্চল্য সৃষ্টি হইল। কয়েক মাসের মধ্যে ইহার গ্রাহক সংখ্যায় এগার হাজারে দাঁড়াইল। মনে রাখিতে হইবে যে, ইহার বার্ষিক চাঁদা ছিল আট টাকা। এই বিবেচনায় এগার হাজার কাটতিকে অসামান্য সাফল্য বলিতে হইবে। তা ছাড়া ইহার অধিকাংশ পাঠক ছিল মুসলমান। প্রতিক্রিয়াশীলদের মধ্যে ইহা এরূপ আলোড়ন সৃষ্টি করিল যে, অল্পদিন পরে সাহেবজাদা আফতাব আহমদ খাঁ "আল হেলালের" বিরুদ্ধে প্রকাশ্যভাবে আন্দোলন করিতে কুণ্ঠিত হন নাই।

পত্রিকাখানি প্রকাশিত হইত কলিকাতায়। কিন্তু যুক্তপ্রদেশ, পাঞ্জাব, বিহার প্রভৃতি অঞ্চলে ইহা আদরের সহিত গৃহীত হইত। স্থানে স্থানে "আল্ হেলাল" পড়িবার জন্য ও আলোচনা করিবার জন্য পাঠচক্র গঠিত হইল। সেখানে বহু পণ্ডিত ও আলেমগণ আসিয়া আলোচনায় যোগ দিতেন। মুসলিম সুধীদের উপর 'আল্ হেলাল' কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল তাহার দু'একটা দৃষ্টান্ত দিব। মওলানা মহমুদুল হোসেন দেওবন্দের একজন সুবিখ্যাত আলেম ছিলেন। তিনি স্বীকার করিয়াছেন যে, "আল্ হেলাল" পড়িবার পূর্ব্বে রাজনীতি ও আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে তাঁহার কোন ধারণা ছিল না। বস্তুতঃ 'আল্ হেলালের' প্রভাবেই তিনি অসহযোগ আন্দোলনের যুগে রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং তজ্জন্য কারাবরণ পর্য্যন্ত করিয়াছিলেন। মওলানা মহম্মদ আলি ও মওলানা শওকত আলি ও ডাক্তার ইকবালকে ইসলামের মহিমার প্রতি "আল্ হেলালই" আকৃষ্ট করিয়াছিল। মওলানা আজাদই তাঁহাদিগকে ইস্লামের সত্যিকারের রূপের সহিত পরিচিত করাইয়াছিলেন। মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাপারে মওলানা মহম্মদ আলি "কমরেডে" মওলানা আজাদের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি পরে মওলানা আজাদের মত গ্রহণ করিয়াছিলেন। মওলানা শওকত আলি প্রকাশ্যভাবে স্বীকার করিয়াছেন যে, "আল্ হেলাল নে হাম কো ইমান্‌কা রাস্তা বাতা দিয়া" (অর্থাৎ আল্ হেলালই আমাকে ইমানের পথ দেখাইয়াছে)। কবি স্যার ইক্‌বালের বিখ্যাত গ্রন্থ "আস্‌রার-এ-খুদী" ও "রমুজে-বে-খুদী" আল্ হেলালের দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছে। স্যার ইকবালের ইস্লাম সম্বন্ধে কয়েকটি সুচিন্তিত

প্রবন্ধ আছে—বলা বাহুল্য তাহাব মূল আদর্শ ও প্রেরণা তিনি মওলানা আবুল কালামের আল্ হেলাল হইতে পাইয়াছিলেন।

"আল্ হেলালে" মওলানা আজাদ তাঁহার রাজনৈতিক, ধর্ম্মনৈতিক ও সামাজিক মতবাদ অকপটে ব্যক্ত করিতেন। দ্বিধাগ্রস্থভাবে কোন কথা বলেন নাই। সুস্পষ্ট, সুতীব্র ও জ্বলন্ত ভাষায় মনের কথা প্রচার করিতেন। ১৯১৩ সালে অযোধ্যা প্রদেশে গো-বধ লইয়া একটি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হইযাছিল। সেই সময় মওলানা আজাদ নির্ভীকভাবে মুসলমানদিগকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিয়াছিলেন, "ইস্লাম শান্তির ধর্ম্ম। গো-বধের অধিকারের উপর অত্যধিক জোর দিলে অশান্তির সৃষ্টি হইবে। তাহা হইলে উহা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির পথে বিঘ্ন উৎপাদন করিতে পারে।" "আল্ হেলালে" তাঁহার এই দুঃসাহসিক আলোচনা দেখিয়া তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধু হাকিম আজমল খাঁ তাঁহার উপর রাগান্বিত হইয়াছিলেন। এ সম্পর্কে উভয়ের মধ্যে বহু আলোচনা ও তর্ক হইয়াছিল। কিন্তু পরে ১৯২০ সালে হাকিম সাহেব নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিলেন এবং মওলানা আজাদের উদার ধর্ম্মব্যাখ্যা গ্রহণ করেন। মওলানা মহম্মদ আলিও এক সময় মওলানা আজাদের তীব্র সমালোচক ছিলেন। পরে তিনিও মওলানা আজাদের ভক্ত ও সমর্থক হইয়া পড়েন। "আল্ হেলালের" প্রভাব ভারতের বাহিরেও বিস্তৃত হইয়া পড়িল। মিশরের বহু পত্রিকায় ইহার আরবী অনুবাদ প্রকাশিত হইত। নিকট প্রাচ্যের মুস্লিম জগৎ সম্বন্ধে তিনি যে সব আলোচনা করিতেন, তাহা এদেশে একেবারে নূতন জিনিষ। ইউরোপীয় ঘটনা এরূপভাবে ঘটিতে লাগিল যে, মওলানা আজাদের

ঘোর নিন্দুকগণও স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন যে, তিনি যে পথের সন্ধান দিতেছেন তাহাই ঠিক পথ, তাহাই একমাত্র পথ, অন্য পথ আর নাই।

মুসলিম জগতের উপর ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের অবিচার ও অত্যাচার তথায় এক নূতন যুগ আনয়ন করিতেছিল। কিন্তু ভারতের ভেদনীতির প্রভাবে সে যুগ আসে নাই। মুসলমান সমাজকে অধিকতর রাজভক্ত করিবার জন্য নানারূপ চেষ্টা হইতেছিল। মওলানা আজাদের এই "আল্ হেলাল" সে সমস্ত চক্রান্তজাল ভেদ করিয়া মুসলমানকে আত্মনির্ভরশীল হইতে উপদেশ দিল। উহা প্রকাশের ছয়মাস মধ্যে একদল মুসলমান যুবক 'আল্ হেলালের' যুক্তির সারবত্তা উপলব্ধি করিলেন। তাঁহারা একটা নূতন রাজনৈতিক চেতনা লাভ করিলেন। আলিগড় দলের প্রভাবে যাহারা প্রতিক্রিয়াশীল হইয়া পড়িয়াছিল, তাহাদের অনেকে 'আল্ হেলালের' প্রভাবের নিকট নিজেদেরকে অসহায় মনে করিল। মিঃ ওয়াজির হোসেন (বর্ত্তমানে স্যার) সে সময় মুসলিম লীগের সম্পাদক ছিলেন। তিনি প্রথমে কঠোরভাবে 'আল্ হেলালের' আদর্শের বিরুদ্ধে আন্দোলন করিয়াছিলেন। কিন্তু পরে মওলানা আজাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বহু আলোচনার পর নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিলেন, এবং সম্পূর্ণভাবে তাঁহার নিকট আত্মসমর্পণ করিলেন। মওলানা আজাদের প্রভাবে পড়িয়াই তিনি মুসলিম লীগের ক্রীড পরিবর্ত্তন করিতে সম্মত হইয়াছিলেন। ১৯১৩ সাল পর্য্যন্ত লীগের ক্রীডে ছিল: "Loyal to British government, and the attainment of the rights of the Musalmans."

কিন্তু সেই বৎসর মুসলিম লীগের বাৎসরিক অধিবেশনে উক্ত শব্দগুলির পরিবর্তে নিম্নলিখিত শব্দগুলি লীগের ক্রীডে সন্নিবিষ্ট হইল :—"attainment of suitable self-government for India" এই বৎসর মুসলিম লীগ সর্ব্বপ্রথম রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য গঠিত দল আখ্যা লাভ করিল। লীগের ক্রীডের এই পরিবর্ত্তনের মূলে আছে মওলানা আজাদের প্রভাব। কিন্তু মওলানা আজাদ 'suitable কথাটাও পছন্দ করেন নাই। তিনি স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেন যে, লীগের ক্রীডে রাজানুগত্যের কোন স্থান নাই। তিনি তৎপরিবর্ত্তে 'পরিপূর্ণ স্বায়ত্তশাসন' কথাটা বসাইতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু মওলানা মহম্মদ আলি রাজানুগত্যের প্রতি অত্যধিক জোর দিতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহার এই আচরণ আজ অনেকের নিকট অদ্ভুত ঠেকিতে পারে। কিন্তু তখন তিনি রাজানুগত্যের প্রয়োজনীয়তার যুক্তি এই ভাবে দিলেন। তিনি 'কমরেড'এ লিখিলেন : "মুসলমান হইতে গেলে জীবনে একবার মাত্র 'কলমা' পড়িলেই চলিবে। কিন্তু ধার্ম্মিক মুসলমান ইহাতে সন্তুষ্ট থাকে না, সে দৈনিক নামাজের সময় বহুবার 'কলমা' উচ্চারণ করে। সেইরূপ যদিও আমরা বৃটিশ সরকারের অনুগত, তবুও আমরা রাজভক্ত হইয়াই সন্তুষ্ট থাকিব না, আমরা সব সময় এই রাজানুগত্যের কথা ঘোষণা করিব। জীবনের প্রত্যেক কাজে রাজানুগত্যের পরিচয় দিব।" মওলানা আজাদের সঙ্গে মওলানা মহম্মদ আলির এইখানে পার্থক্য ছিল। শেষ পর্য্যন্ত মওলানা মহম্মদ আলি মওলানা আজাদের মত গ্রহণ করিয়াছিলেন। মওলানা আজাদ সেই যুগেই একটা উচ্চতম আদর্শ লইয়া সমাজকে আহ্বান

কবিয়াছিলেন। কিন্তু সমাজেব বড বড পণ্ডিতগণ তখনও তত দূর যাইতে সাহস কবেন নাই। ইহাকেই বলে প্রতিভা ও ভবিষ্যৎদৃষ্টি।

১৯১৪ সালে ইউবোপীয় মহাসমব বাধিয়া গেলে এই সময় 'আল্ হেলালেব' লোকপ্রিয়তা আরও বাড়িয়া গেল। ভারতের সর্ব্বত্র প্রায় পঁচিশ হাজাব কপি বিক্রীত হইত। উহার ক্রমবর্দ্ধমান প্রভাবের কথা দুইটি ঘটনা হইতে বুঝিতে পাবা যাইবে। মিঃ ফিলবী (Mr. Philby) একজন সিভিলিয়ান সাহেব, মুলতানে চাকুরী করিতেন। 'আল্ হেলাল' সম্বন্ধে পাঞ্জাব সরকাবকে রিপোর্ট দিবাব জন্য তিনি বিশেষভাবে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি বেশ ভাল উর্দ্দ জানিতেন। 'আল্ হেলালেব' ভাষার ঝঙ্কার ও ভাবের গাম্ভীর্য্য দেখিয়া এরূপ মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, একবাব কোন কার্য্যব্যপদেশে কলিকাতায় আসিয়া মওলানা আজাদেব সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। সাক্ষাতের পব মওলানা আজাদকে তাঁহাব উচ্চাঙ্গেব লেখন-ভঙ্গীব জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলেন। শুধু তাহাই নহে, তিনি মওলানাব সংস্পর্শে আসিয়া আববী শিখিতে মনস্থ কবিলেন, এবং মেসোপটেমিয়া গিয়া "Heart of Arabia" নামক একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিলেন।

দ্বিতীয় ঘটনাটি এইরূপ :—মওলানা আজাদ প্রথম প্রথম বাঙলা দেশের বিপ্লবী দলেব সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। সেই জন্য গোয়েন্দা বিভাগ তাঁহাব উপব সতত: প্রখর দৃষ্টি রাখিত। এই বিভাগেব প্রধান কর্ত্তা স্যার চার্লস ক্লিভল্যাণ্ড (Sir Charles Cleaveland) তাঁহাকে এই ব্যাপারে বিজড়িত করিবাব জন্য সতত: মালমসলা সংগ্রহ কবিতেন। ১৯১৪ সালের

নভেম্বর মাসে মওলানা বুঝিতে পারিলেন যে, 'আল্ হেলালের' ও তাঁহার নিজের ভাগ্য এক মহা পরীক্ষার সম্মুখীন হইয়াছে। ঠিক এই সময় এলাহাবাদের 'পায়োনিয়র' (Pioneer) সংবাদপত্র কয়েকটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধে মওলানার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ করে যে, তিনি জার্মাণীর হইয়া প্রচারকার্য্য চালাইতেছেন। 'আল্ হেলালের উপর কিরূপ সতর্ক দৃষ্টি দেওয়া হইত, তাহা ইহা হইতে বুঝা যাইবে। 'পায়োনিয়ার' একটি প্রবন্ধে এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিল: "আল্ হেলাল একটি সুচিত্র উর্দ্দু সাপ্তাহিক পত্র। ইহা কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হয়। আবুল কালাম নামক একজন দিল্লীওয়ালা মুসলমান ইহার সম্পাদক। এই সব প্রদেশে মুসলমানদের মধ্যে ইহার বহুল প্রচার আছে। ভারতের অপরাপর অঞ্চলে ইহা চলিয়া থাকে। যুদ্ধ ঘোষণার সময় হইতে ইহার টান জার্ম্মাণীর দিকে। অথচ আশ্চর্য্যের বিষয় যে, সরকার এখনও এই পত্রিকাকে প্রকাশ করিতে অনুমতি দিতেছেন। ইহার কারণ এই যে, উর্দ্দুতে প্রকাশিত হয় বলিয়া কলিকাতায় ইহার ভাষা খুব কম লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বোধ হয় ইহার সম্পাদক এই জন্য কলিকাতা হইতে এই পত্রিকা প্রকাশ করিয়াছেন। আর একটা কারণ ইহাই মনে হয় যে, 'আল্ হেলালের' ভাষা খুব উপমাবহুল। ইহার গোপন ইঙ্গিত, বিদ্রূপ ও নানাবিধ অলঙ্কারপূর্ণ ভাষা অনেকে ধরিতে পারে না। এই ভাষা যখন ইংরেজিতে অনুবাদ হয়, তখন ইহার মূল অর্থ অন্তর্নিহিত হইয়া যায়, অথবা ইহা যে অর্থ বুঝাইতে চায় অনুবাদে তাহা প্রকাশ হয় না। ইউরোপীয় কর্ম্মচারীগণ মূল ভাষা পড়িতে পারেন না।" ইহার পর 'আল্ হেলাল' হইতে কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করিয়া 'পায়োনিয়ার'

বলিতেছেন ঃ "আমবা নিরাপদে বলিতে পরি যে, এই সময় সরকার যদি একজন বৃটিশ প্রজাকে এই ধরণেব লেখা প্রকাশ করিতে অনুমতি দেন, তাহা হইলে বলিব, সবকার অন্যায়ভাবে উদাবতা দেখাইতেছেন।"

সে যাহা হউক, মওলানা আজাদ যে অশেষ শক্তিশালী লেখনী পবিচালনা কবিতেন, তাহাব প্রভাব যে বহু লোককে চঞ্চল কবিয়া তুলিযাছিল তাহাতে কোন সন্দেহ ছিল না। তাঁহাব প্রবন্ধগুলি এমন সব চিত্র ও সংবাদ দ্বাবা পূর্ণ থাকিত যে, তাহা বহু ইংবেজি পত্রিকাতেও পাওয়া যাইত না। তাছাড়া অপ্রিয় সত্য বলিবার তাঁহাব অসীম সাহস ছিল। সেই জন্য সবকাব 'আল্ হেলালকে' আর উপেক্ষা কবিতে পারিলেন না। আঠাব মাসকাল সবকাব 'আল্ হেলালেব' উপব হস্তক্ষেপ কবেন নাই। কিন্তু 'পায়োনিয়াবেব' মন্তব্যেব পব আব উদাসীন থাকিতে পারিলেন না। প্রথমে 'আল্ হেলালেব' জামিন বাজেয়াপ্ত কবা হইল। কিন্তু ইহার পূর্ব্বে কয়েকটি প্রদেশে 'আল্ হেলালেব' প্রবেশ নিষিদ্ধ হইয়াছিল। জামিন বাজেয়াপ্তিব পব মওলানা আবুল কালামের উপব আদেশ হইল—তিনি পাঞ্জাব, যুক্তপ্রদেশ ও মাদ্রাজে প্রবেশ করিতে পাইবেন না। তৎপর ১৯১৫ সালের ৭ই এপ্রিল বাঙলা সবকাব তাঁহাকে বাঙলা হইতে বিতাড়িত করিলেন। তিনি বাধ্য হইয়া স্বাস্থ্যলাভের আশায় রাঁচিতে আশ্রয় লইলেন। সেখানে তাঁহাকে ভাবত সবকাব অন্তবীণে আবদ্ধ কবিলেন। বন্দী অবস্থায় তিনি মসজিদে গমন কবিয়া নামাজ পড়িতেন, শুক্রবারে ইমামতি করিতেন ও 'খোতবা' পাঠ কবিতেন। তাঁহাকে পড়িবার জন্য পুস্তকাদি দেওয়া হইয়াছিল। এইখানে এই অবস্থায় তিনি 'তাজ্‌কীরা' (বা আত্মজীবনী) ও পবিত্র

কোব-আন-শরীফের কিয়দংশ ভাষ্যসহ উর্দ্দুতে অনুবাদ করেন, যাহা পরে "তারজুমান্থল্-কোব-আন" নামে পুস্তকাকাবে প্রকাশিত হইয়াছে। অবশেষে ভারত সবকাব তাঁহাকে ১৯২০ সালেব প্রথম দিকে মুক্তি দিলেন। মুক্তিব পর তাঁহার জীবনের আব এক অধ্যায় আবস্ত হইল।

অসহযোগ আন্দোলনের যুগ

অসহযোগ আন্দোলনের যুগে মওলানা আজাদ যে ত্যাগ, কর্ম্মকৌশল ও বাজনীতি জ্ঞানের পবিচয় দিয়াছিলেন তাহা অতুলনীয়। অন্তরীণ হইতে মুক্তি পাইয়া মওলানা আজাদ নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিলেন না। তাঁহার শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল , বিশ্রামেব প্রয়োজন ছিল। কিন্তু তিনি সেদিকে লক্ষ্য কবিবাব অবসর পাইলেন না। তিনি এক নব যুগের সামনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই কর্ম্মচাঞ্চল্য, এই জাগবণ ও এই সাহসিকতার জন্য তিনি এতদিন সাধনা করিয়াছিলেন। আজ তাঁহাব স্বপ্ন পূর্ণ হইতে চলিয়াছে, আব তিনি স্বাস্থ্যেব অজুহাতে বিশ্রাম কবিবেন ? ইহা তাঁহার প্রকৃতিব বিরুদ্ধে। তিনি মুক্তি পাইয়া দেখিলেন—দেশের সর্ব্বত্র জাগবণের বিপুল সাড়া পড়িয়াছে। রাউলাট আইনেব প্রতিবাদ কবিবাব জন্য মহাত্মা গান্ধী সত্যাগ্রহ আন্দোলন আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার আহ্বানে চাবিদিকে অপূর্ব্ব সাড়া পড়িয়াছে। আসমুদ্র হিমাচল সমগ্র ভারতে একটা স্পন্দন অনুভূত হইতেছে। পাঞ্জাবে ইহার তীব্রতা এতদূব বৃদ্ধি পাইল যে, সরকার সীমা লঙ্ঘন কবিয়া অমৃতসরের জালিনওয়ালাবাগে নিষ্ঠুবতার পবাকাষ্ঠা দেখাইলেন। জালিনওয়ালাবাগে হিন্দু-মুসলমান ও শিখেব বক্ত একই স্থানে মিলিত হইল। এই ঘটনা দেখিয়া মওলানা আজাদ বলিতেছেন : "যে অস্থায়ী কারণে স্যার সৈয়দ আহমদ মুসলমানের কংগ্রেসে যোগদানেব পথে যে অস্থায়ী প্রাচীর সৃষ্টি কবিয়াছিলেন,

আজ ত্রিশ বৎসর পর জেনেরাল ডায়ার চিরস্থায়ীভাবে সেই প্রাচীর ভাঙ্গিয়া দিলেন, এবং ভারতের মুসলমানকে ১৯১৯ সালের অমৃতসরে কংগ্রেস অধিবেশনে যোগদান করিবার পথ সুগম করিয়া দিলেন। ইহা যেন ভারতের জাতীয়তার অগ্রদূত। ডায়ারের নৃশংস বুলেট হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে কোন পার্থক্য করিল না। যে শিখ সম্প্রদায় মুসলমান অপেক্ষাও অধিক রাজভক্ত ছিল, তাহারাও হিন্দু ও মুসলমান শহীদদের সহিত তাহাদের পুণ্যভূমি অমৃতসরকে নিজেদের বুকের রক্তে রঞ্জিত করিয়াছিল। এই সবের পশ্চাতে যেন খোদার হাত ছিল।" পাঞ্জাব অনাচারের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত হইয়াছিল খেলাফত্ অনাচার। বিগত প্রথম মহাসমরের সময় ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী লয়েড জর্জ্জ ভারতের মুসলমানকে এই প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন যে, তাহাদের পবিত্র তীর্থস্থান যথা মক্কা, মদীনা ও জেরুজালেমের পবিত্রতা ও স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করা হইবে না। কিন্তু বিজয় লাভের পর মিত্রপক্ষ সে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিলেন না। মিত্রপক্ষের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গে ভারতের মুসলমান সমাজ মর্ম্মাহত হইল। তাহারা সমস্ত দুঃখ ও কষ্ট সহ্য করিয়া এই আচরণের প্রতিবাদ করিতে ও ব্রিটিশ সরকারের সিদ্ধান্তকে উল্টাইয়া দিতে সঙ্কল্প করিল। কতকগুলি নেতৃস্থানীয় মুসলমান তখনও পর্য্যন্ত ব্রিটেনের উপর আস্থা হারান নাই, ব্রিটেনের বিচার-বুদ্ধি সম্বন্ধে সন্দীহান হইতে পারেন নাই। তাই তাঁহারা বড় লাটের নিকট তাঁহাদের অভিযোগ পেশ করিয়া একটি ডেপুটেশন প্রেরণ করিলেন। ইহার বহু বৎসর পূর্ব্বে কর্ত্তপক্ষের ইঙ্গিতে মাননীয় আগা খাঁ পৃথক নির্ব্বাচন দাবী করিবার জন্য বড় লাটের নিকট একটি ডেপুটেশন লইয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। তখন তাঁহার আবেদন

সহজেই গৃহীত হইয়াছিল। কিন্তু এ ডেপুটেশন স্বতন্ত্র ধরণের। ইহাতে ভেদনীতিব সমস্ত কূট কৌশল ব্যর্থ হইতে পারে। তাই এই ডেপুটেশনেব দ্বাবা কোন ফল হইল না। নেতাবাও ছাডিবাব পাত্র নহেন। তাঁহারা বিলাতেও একটি ডেপুটেশন প্রেবণ কবিলেন। কিন্তু তাহাও ব্যর্থ হইল। ব্রিটিশ সবকাব বহু বৎসবেব কূটনীতিব পব নিকট-প্রাচ্যে যে সব সুবিধা পাইয়াছেন তাহা কি পরাধীন ভারতেব কতকগুলি ভদ্রলোকের ডেপুটেশনের অনুবোধে পবিত্যাগ কবিতে পাবেন? যখন মুসলিম নেতারা ভাল করিয়াই বুঝিলেন যে, এই ধরণেব ডেপুটেশনে কোন কাজ হইবে না, তখন তাঁহাবা অন্য উপায় অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। হাতের নিকট পাইলেন মহাত্মা গান্ধীব অহিংসাব অস্ত্র। তাহাকেই তাঁহারা সানন্দে তুলিয়া লইলেন। একদল বিজ্ঞ মুসলিম প্রশ্ন তুলিলেন, অহিংস অসহযোগ ইস্‌লামের অনুমোদিত নীতি কি না? যখন এই প্রকাব সন্দেহদোলায় মুসলমান নেতাগণ দুলিতেছিলেন, ঠিক সেই সময় মওলানা আজাদ তাঁহার বিশ বৎসরেব সাধনা লইয়া তাঁহাদের নিকট খোদার আশীর্বাদস্বরূপ উপস্থিত হইলেন। তাঁহার গভীব জ্ঞান, অপূর্ব্ব প্রতিভা ও শিক্ষা-সাধনা, অতুলনীয় বাগ্মিতা, অদ্ভুত দৃঢতা ও চিন্তাশক্তি, প্রখর দূরদৃষ্টি ও যুগোপযোগী বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী—এই লইয়া তিনি প্রস্তুতই ছিলেন। মুক্তি পাইয়াই তিনি এই কঠিন সমস্যাব সমাধানেব জন্য আত্মনিয়োগ করিলেন। অন্যান্য বহু মুসলিম-নেতা অপেক্ষা তিনি বয়সে ছোট ছিলেন। কিন্তু যোগ্যতায় তিনি সকলের ঊর্দ্ধে ছিলেন। তাঁহাকে পাইয়া গান্ধীজির শক্তি বহু গুণ বাডিয়া গেল—"He was a tower of strength to Gandhiji।" মওলানা আজাদ সমস্ত শাস্ত্র ঘাঁটিয়া দেখাইয়াছিলেন যে,

উপস্থিত অবস্থায় অহিংস অসহযোগ ব্যতীত মুসলমানের অন্য কোন পথ নাই।

ইহার পূর্ব্বে গান্ধীজির সহিত তাঁহার কোন পরিচয় ছিল না। ১৯২০ সালের ১৮ই জানুয়ারী দিল্লীতে তিনি গান্ধীজির সহিত প্রথম সাক্ষাৎ করেন। সেই সময় দেশের হিন্দু-মুসলমান নেতৃবর্গ দিল্লীতে বড লাটের নিকট ডেপুটেশন লইয়া যাইবার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। খেলাফত তথা তুরস্ক সম্বন্ধে ভারতের মতামত বড লাট সকাসে নিবেদন করাই ছিল এই ডেপুটেশনের উদ্দেশ্য। যদিও এই ডেপুটেশনে মওলানা আজাদও স্বাক্ষর করিয়াছিলেন; কিন্তু নিজে কিছুতেই বড় লাট সকাসে যাইতে সম্মত হন নাই। তিনি স্পষ্টভাবে বলিলেন: "ইহাতে কোন কাজ হইবে না। ইহা বাস্তব পন্থা নহে। প্রকৃত কাজ করিতে হইলে সংগ্রামমূলক কাজ করা দরকার।" মওলানা মহম্মদ আলি ও অন্যান্য বন্ধুগণ তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ পীডাপীডি করিলেন। কিন্তু তিনি অচল, অটল। যাহা হউক, তাঁহাকে বাদ দিয়াই ডেপুটেশনের নেতাগণ বড় লাটের নিকট উপস্থিত হইলেন।

মওলানা আজাদ যাহা আশঙ্কা করিতেছিলেন তাহাই হইল। বড লাট উত্তর দিলেন যে, তাঁহার কিছু করিবার হাত নাই। তবে এই আশ্বাস দিলেন যে, যদি নেতাগণ বিলাতে ডেপুটেশন পাঠাইতে ইচ্ছা করেন, তবে তিনি তাঁহাদিগকে সাহায্য করিবেন। অতঃপর ডেপুটেশনের নেতারা স্থির করিলেন যে, মওলানা মহম্মদ আলির নেতৃত্বে বিলাতে একটি ডেপুটেশন যাইবে। তিনি (মহম্মদ আলী) যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। কিন্তু এই সময় আর একটা প্রশ্ন উঠিল। নেতাগণ কি ডেপুটেশন লইয়া ক্ষান্ত

থাকিবেন, না তৎসঙ্গে অন্য কোন সাক্ষাৎ সংগ্রাম বা পন্থা গ্রহণ করিবেন? মওলানা আজাদ দৃঢভাবে জানাইলেন যে, ভিক্ষা, প্রার্থনা, আবেদন-নিবেদন ও ডেপুটেশনের যুগ চলিয়া গিয়াছে। তাঁহাদিগকে সাক্ষাৎভাবে ও সক্রিয়ভাবে সরকারকে চাপ দিবার জন্য একটা কর্ম্মপরিক্রমা গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু অধিকাংশ নেতা মওলানা আজাদেব পথে যাইতে অসম্মতি জানাইলেন। তাঁহাবা ব্রিটিশেব বিচার-বুদ্ধিতে তখনও বিশ্বাস হাবান নাই—মওলানা মহম্মদ আলিও তখন পর্য্যন্ত সাক্ষাৎ সংগ্রামের ঘোব বিবোধী ছিলেন। তা ছাডা অধিকাংশ নেতাদের গঠনমূলক প্রস্তাব সম্বন্ধে কোন ধাবণা ছিল না। আব যদি কেহ এইরূপ কোন প্রস্তাব উপস্থিত কবিতেন, তবে তাহার দোষ ত্রুটি দেখাইতে আগ্রহান্বিত হইতেন।

হঠাৎ কোন নেতা একটা সর্ব্ববাদী সম্মত পরিকল্পনা রচনা করিতে পাবিলেন না। দীর্ঘকাল আলোচনার পর হাকিম আজমল খাঁর গৃহে চুডান্ত মীমাংসাব জন্য একটা পবামর্শ সভা বসিল। কিন্তু কোন ফল হইল না। অবশেষে গান্ধীজী প্রস্তাব করিলেন যে, একটি সাব-কমিটি গঠিত হউক। সকলেই তাঁহার এই প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন। মহাত্মা গান্ধী, মওলানা আজাদ ও হাকিম সাহেব এই তিন জন নেতা সাব্-কমিটির সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন। তাঁহারা বহু পরামর্শ কবিয়া কর্ম্মপদ্ধতিব জন্য একটি খসড়া রচনা কবিলেন। সাব্-কমিটির এই খসডাই অসহযোগ আন্দোলনের গোড়া-পত্তন। অসহযোগ আন্দোলনের মূলনীতি এই সাব্-কমিটি ঠিক করে। মহাত্মা গান্ধী তাঁহার অপার সৃজনী ক্ষমতাব সাহায্যে ইহাব বিস্তৃত অংশগুলি যোগ করেন। কিন্তু মহাত্মা গান্ধী স্বীকাব করিয়াছেন যে, ইহাতে মওলানা আজাদের যথেষ্ট

হাত ছিল। পরে এই প্রস্তাব একটি বৃহত্তর কমিটিতে গৃহীত হইবার জন্য উপস্থাপিত হইল। মওলানা আজাদ সকলকে বুঝাইলেন যে, বর্ত্তমানে ইহা ব্যতীত অন্য কোন শ্রেষ্ঠতর পন্থা নাই। পরের দিন ডেপুটেশনের সদস্যগণ আবার মিলিত হইলেন। মওলানা আজাদ ও গান্ধীজী তাঁহাদের সকলের নিকট প্রস্তাবটির সার মর্ম্ম বুঝাইয়া দিলেন। কিন্তু তাঁহারা তখনও ইতস্ততঃ করিতেছিলেন। লক্ষ্ণৌ ফিরিঙ্গীমহলের পরলোকগত মওলানা আব্দুল বারী, মওলানা মহম্মদ আলি ও মওলানা শওকত আলি উক্ত প্রস্তাব সম্বন্ধে তখনও মনস্থির করিতে পারেন নাই। তাঁহারা বুঝিবার জন্য সময় চাহিলেন। কিন্তু হাকিম আজমল খাঁ মওলানা আজাদকে পূর্ণ সমর্থন করিলেন। এই সময় মিরাটে খেলাফত্ কনফারেন্স হইতেছিল। মহাত্মা গান্ধী ও মওলানা আজাদ তৎক্ষণাৎ দিল্লী হইতে মিরাট রওয়ানা হইলেন এবং এইখানে তাঁহারা সর্ব্বপ্রথম জনসাধারণের নিকট অসহযোগ আন্দোলনের কর্ম্মধারা উপস্থিত করিলেন। ইহার কিছুদিন পরে ফেব্রুয়ারী মাসের শেষে কলিকাতায় দ্বিতীয় খিলাফত্ কনফারেন্সের অধিবেশন হইল। মওলানা আজাদ ইহার সভাপতি নির্ব্বাচিত হইলেন। তিনি তাঁহার অভিভাষণে অসহযোগের প্রস্তাবটিকে মুসলমানগণকে গ্রহণ করিবার জন্য কাতর ভাবে সুপারিশ করিলেন। বলা বাহুল্য, তাঁহার এই আবেদন ব্যর্থ হইল না। অতঃপর দেশের নানাস্থানে অসহযোগের প্রস্তাব গৃহীত হইল। কিন্তু কংগ্রেস এপর্য্যন্ত নারব ছিল। অতঃপর কলিকাতায় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে ও নাগপুরের বাৎসরিক অধিবেশনে অসহযোগ আন্দোলনের সমস্ত কর্ম্মধারা গৃহীত হইল। এইভাবে দেশের আবহাওয়া পরিষ্কার হইয়া গেল।

অসহযোগেব বিভিন্ন ধাবা যথা, ব্যবস্থাপক সভা বয়কট, স্কুল কলেজ বর্জ্জন, খেতাব বর্জ্জন, কোর্ট-আদালৎ বয়কট প্রভৃতি সর্ব্বত্র সভাসমিতির মধ্য দিয়া গৃহীত হইতে লাগিল। তাবপব যাহা হইল সে ইতিহাস বলিবার মত স্থান এখানে নাই। ভাবতেব ঘুমন্ত মানবতা হঠাৎ যাদু কাঠি স্পর্শে জাগিয়া উঠিল। মহাত্মা গান্ধী, মওলানা আবুল কালাম, দেশবন্ধু চিত্তবঞ্জন, মওলানা মহম্মদ আলি, শওকত আলি, পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু, লালা লাজপৎ রায় প্রমুখ নেতৃবৃন্দ সমগ্র ভাবত অসহযোগেব বন্যায় তোলপাড কবিযা তুলিলেন। জাতিব জাগরণের এই মহা মুহূর্ত্তে মওলানা আজাদের প্রভাব সর্ব্বত্র বিশেষ-ভাবে অনুভূত হইতে লাগিল। মুসলিম উলেমাদেব সাধাবণ সভা ও বিশেষ সভায় সর্ব্বদায়ই তাঁহাকে উপস্থিত থাকিতে হইত। ভাবতেব বিভিন্ন প্রদেশের উলেমাদেব প্রতিনিধিগণ লাহোবে 'একটি উলেমা কনফাবেন্স আহ্বান কবিলেন। তাঁহাবা অসহযোগ আন্দোলনকে বিনা প্রতিবাদে গ্রহণ কবিলেন। এই সভায় আর একটি যে প্রস্তাব উত্থাপিত হইল তাহা হইতে মওলানা আজাদেব চবিত্রেব বৈশিষ্ট্য বেশ বুঝা যাইবে। উলামাগণ প্রস্তাব করিলেন যে, অতঃপব মুসলমানদেব নেতারূপে মওলানা আজাদ সাহেবকে "ইমামুল্-হিন্দ" অর্থাৎ 'মুস্লিম ভাবতেব একচ্ছত্র নেতা' এই পদে অভিষিক্ত কবা হউক। এক জন আলেমেব পক্ষে এত বড সম্মানজনক পদ কম শ্লাঘাব বিষয় নহে। কিন্তু মওলানা আজাদ বিনয়েব সহিত এই সম্মানিত পদ প্রত্যাখ্যান কবিলেন। উলামাগণেব অনেকে রক্ষণশীল মত পোষণ কবিতেন। তাঁহাবা মওলানা আজাদেব বহু মত গ্রহণ করেন নাই। তবুও তাঁহাবা মওলানা আজাদকে এই পদ গ্রহণ করিবাব জন্য পীডাপীড়ি কবিতে লাগিলেন।

কিন্তু মওলানা আজাদ কিছুতেই এই সম্মানজনক পদ গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন না। ইহার কিছুদিন পরেই তিনি গ্রেপ্তার হইলেন। ১৯২৩ সালে তিনি যখন মুক্তি পাইলেন, তখন উলামাগণ আবার তাঁহাকে "ইমামুল্-হিন্দ" পদ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু এবারও তিনি তাহা প্রত্যাখ্যান করিলেন। তিনি 'জমিয়তে-উলামার' কার্য্যকরী সমিতিকে বুঝাইয়া বলিলেন যে, এই পদ সৃষ্টি করিলে পরে নানা অসুবিধার উৎপত্তি হইতে পারে, এমন কি মুসলমানের মধ্যে ব্যক্তি-পূজা আরম্ভ হইতে পারে। একজন ব্যক্তি যত বড় পণ্ডিত তিনি হউন না কেন—তাঁহাকে এই ভাবে সম্মানিত করিলে পরে এই পদ উত্তরাধিকারের মত একটা ব্যক্তিগত সম্পত্তি হইয়া যাইবে, এবং হয়ত অযোগ্য লোক উহার অধিকারী হইয়া জাতির উন্নতির পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করিতে পারে। এই স্বেচ্ছাপ্রণোদিত ত্যাগ অসাধারণ ত্যাগ। তাঁহার এই ত্যাগ-নিষ্ঠা উলামাদের নিকট তথা দেশ-বাসীর নিকট তাঁহার সম্মান বহু গুণে বাড়াইয়া দিল। মওলানা যে খাঁটি গণতান্ত্রিক নীতিতে বিশ্বাস করেন ইহা তাহারই একটি প্রমাণ।

অসহযোগ আন্দোলনের কয়েক বৎসর ভারতের ইতিহাস এক মহা গৌরবের যুগ। প্রত্যেক ভারতবাসী আজিও গর্ব্বের সহিত, আনন্দের সহিত এই যুগের কথা স্মরণ করিয়া থাকে। এই যুগে ভারতের হিন্দু ও মুসলমান সম্মিলিত ভাবে সর্ব্বপ্রথম বুঝিল যে, একতাই তাহাদের শক্তি; সংহতিই তাহাদের প্রেরণা, প্রেমই তাহাদের বন্ধন। এই একতা, সংহতি ও প্রেম থাকিলে তাহারা স্বাধীন হইতে বাধ্য। তদ্ব্যতীত তাহাদের চলিবে না, চলিতে পারে না। জালিনওয়ালাবাগের রুধিরাক্ত প্রাঙ্গনে হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান

শিখকে যে একতা বন্ধনে আবদ্ধ করিয়াছিল, তাহা সত্যিকারের বন্ধন। মহাত্মা গান্ধী, মওলানা আবুল কালাম, মওলানা মহম্মদ আলি, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, পণ্ডিত মতিলাল প্রভৃতির অপার প্রভাব দেশে একটা অভূতপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন আনয়ন করিল। মুসলমান বুঝিল যে, রাজনীতিতে বৈরাগ্যে তাহাদের লাভ নাই। হিন্দু বুঝিল, তাহাদের এত দিনের সাধনা সিদ্ধিলাভ করিতে চলিয়াছে। চারিদিকে উত্তেজনা, উদ্দীপনা, সভাসমিতি। সরকার এ দৃশ্য নীরবে দেখিতে পারিলেন না। তাঁহারা ধড়পাকড় আরম্ভ করিলেন। এই সময় গণজাগরণ এরূপ প্রবল হইয়া পড়িয়াছিল যে, সরকার উহাতে ভীত হইয়া পড়িলেন। ধরপাকড়ে তাঁহারা ইহা বন্ধ করিতে পারিলেন না। কিন্তু তবুও দমন-নীতি বন্ধ হইল না। সকল বড় বড় নেতা হাসিতে হাসিতে জেলে গেলেন। আলি-ভ্রাতৃদ্বয়, পণ্ডিত মতিলাল নেহরু প্রভৃতি কারাগারে রুদ্ধ হইলেন। এই সময় তদানীন্তন বড় লাট লর্ড রিডিং গবর্ণমেণ্ট ও কংগ্রেসের মধ্যে একটা আপোষের প্রস্তাব করিলেন, এবং এই ইচ্ছা জানাইলেন যে, একটি গোলটেবিল বৈঠক দ্বারা কংগ্রেসের প্রস্তাব আলোচনা করিবেন। কিন্তু গান্ধীজী দৃঢ় ভাবে জানাইয়া দিলেন যে, আলি-ভ্রাতৃদ্বয়ের মুক্তি ব্যতীত ইহা সম্ভব হইবে না। কিন্তু সরকার বিনা সর্ত্তে তাঁহাদিগকে মুক্তি দিতে সম্মত হইলেন না। ইহার কিছুদিন পরে ইংলণ্ডের যুবরাজের ভারত পরিদর্শনের কথা ঘোষিত হইল। সরকার চাহিয়াছিলেন যেন এজন্য কোনরূপ বয়কট আন্দোলন না হয়। কিন্তু গান্ধীজী আলি ভ্রাতৃদ্বয়ের বিনা সর্ত্তে মুক্তি ব্যতীত সরকারের সহিত কোনরূপ আলোচনা করিতে অগ্রসর হইলেন না। সরকারও ছাড়িবার পাত্র

নহেন। তাঁহারা কঠোর ভাবে দমননীতি চালাইতে লাগিলেন। এবং তাহার ফলে একে একে বহু নেতা গ্রেপ্তার হইতে লাগিলেন। মওলানা আবুল কালাম, লালা লাজপৎ রায়, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু, সুভাষচন্দ্র সকলেই গ্রেপ্তার হইলেন। ইতিমধ্যে মহাত্মা গান্ধী আইন অমান্য আন্দোলন চালাইবার আয়োজন করিতেছিলেন। কিন্তু হঠাৎ চৌরীচেরার লোমহর্ষণ হত্যাকাণ্ডে তিনি এত ব্যথিত ও ক্ষুব্ধ হইলেন যে, তিনি আইন অমান্য আন্দোলন বন্ধ করিয়া দিলেন। ইহার কিছুদিন পর তিনিও গ্রেপ্তার হইলেন। বড় বড় নেতারা কারাগারে। তদুপরি হঠাৎ আইন অমান্য আন্দোলন স্থগিত। সর্ব্বশেষে মহাত্মাজীর গ্রেপ্তার—এই তিন ঘটনা দেশের মধ্যে একটা অবসাদ ও জড়তা আনিয়া দিল। কারাগারের বাহিরে যাঁহারা ছিলেন, তাঁহারা জনসাধারণের মধ্যে আর অনুপ্রেরণা জাগাইতে পারিলেন না। তাঁহাদের গঠনমূলক কার্য্যের আবেদন ব্যর্থ হইল। সমগ্র দেশে একটা বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। কোন যুদ্ধরত সেনাপতির গ্রেপ্তারে সুগঠিত সৈন্যদলের মধ্যে যেরূপ বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়, সেই সময়ে দেশের অবস্থাও সেইরূপ হইল। অসহযোগ আন্দোলনের সূচনা হইতে যে সব সাম্প্রদায়িক নেতা জাতীয় জাগরণের শুভক্ষণে নিষ্ক্রিয় দর্শকের মত দূরে দাঁড়াইয়াছিলেন, তাঁহারা বুঝিলেন যে, তাঁহাদের হৃত গৌরব ফিরিয়া পাইবার এই অবসর। তাঁহারা ধীরে ধীরে নানা মূর্ত্তিতে, নানা ছলছুতা ধরিয়া আসরে নামিতে লাগিলেন। যে তৃতীয়পক্ষ ভীত চকিত চিত্তে দেশের এই জাগরণ নিরীক্ষণ করিতেছিল, তাহারা এসব সাম্প্রদায়িক নেতাদেরকে যথাসময়ে কাজে লাগাইয়া দিল। এতদিন

যে 'divide and rule' পলিসি অচল হইয়া গিয়াছিল, তাহা আবার ক্ষেত্র পাইয়া জাঁকিয়া বসিল। সরকারের এই ভেদনীতি ১৯১৯ হইতে ১৯২২ সাল পর্য্যন্ত সর্ব্বপ্রকারে ব্যর্থ হইতেছিল। অসহযোগ আন্দোলন মন্দীভূত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাহাই আবার সক্রিয় হইয়া উঠিল। সংশ্লিষ্ট দলগুলি, স্বার্থপর নেতাগুলি এবং অদূরদর্শী উপনেতাগণ অজ্ঞ লোকের সবল বিশ্বাস ও ভ্রান্ত ধারণা লইয়া ছিনিমিনি খেলিতে আরম্ভ করিল। আমরা কেবল সরকারকে দোষ দিয়া কর্ত্তব্য শেষ করিতে চাই। কিন্তু তাহা একতরফা অভিযোগ। আমাদের নিজেদের দোষেরও সীমা নাই। আমাদের শিক্ষিত ব্যক্তিগণ কেন এই ভেদনীতির দাস হইয়া পড়েন? কেন আমরা লোকদিগকে সাবধান করিয়া দিই না? পরাধীন দেশের দুর্ভাগ্য এই যে, বিদেশী শক্তি অপেক্ষা দেশের লোকই স্বাধীনতার পক্ষে অধিকতর কণ্টক সৃষ্টি করে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, কংগ্রেসের নেতাদের কারাগমনের পর সরকারের ভেদনীতি সফল হইয়াছে। ইহার পরবর্ত্তী ঘটনা প্রমাণ করিতেছে যে, ইতিপূর্ব্বে আমাদের যে একতা হইয়াছিল, তাহা অস্থায়ী—যে জাগরণ হইয়াছিল তাহা মাতালের মত্ততা মাত্র,—মদিরাময় আবেশমাত্র। ইহা হৃদয়ের একতা ছিল না, প্রাণে প্রাণে মিলন ছিল না। সুতরাং গোবধ ও বাদ্যভাণ্ডের প্রশ্নে আবার আমাদের আদিম পৈশাচিক প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠিল। এই সময় "give and take" অর্থাৎ লেনদেনের বাস্তব নীতি সকল প্রকার গণ্ডগোল মিটাইতে পারিত। কিন্তু কেহ সে নীতি-কথা শ্রবণ করিল না। কারণ সাম্প্রদায়িক নেতাগণ ইতিমধ্যেই সমস্ত ক্ষেত্র অধিকার করিয়া বসিল। উদারতা, সহিষ্ণুতা, অপরের দরদ বুঝিবার প্রশস্ত হৃদয়—এইগুলির ছিল

বিশেষ প্রয়োজন। কিন্তু সাম্প্রদায়িক নেতাগণ সে প্রয়োজন মিটাইতে পারিলেন না। তাঁহারা ধরিলেন অন্য পথ। জনসাধারণের মন হইতে এই সমুদয় মহৎ গুণ দূর করিয়া তথায় অনুদারতা, সঙ্কীর্ণতা ও জিঘাংসা প্রবৃত্তি জাগাইবার জন্য তাঁহারা সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করিলেন। নানাবিধ অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটিয়া ১৯১৯-১৯২২ সালের সমস্ত সাধনাকে ব্যর্থ করিতে উদ্যত হইল। সে ভ্রাতৃভাব, সে একপ্রাণতা, সে এক জাতীয়তা—সব দূর হইয়া গেল। অহিংসার প্রতি ভাসা ভাসা আগ্রহ দূর হইয়া গেল। বাহু বল ব্যতীত জনসাধারণের নিকট অন্য কোন আবেদন কার্য্যকরী হইল না।

দেশের এই দারুণ দুর্দ্দিনে অনেক কংগ্রেসী নেতা তাল হারাইয়া গেলেন। হিন্দু ও মুসলমান সমাজের বহু নেতা জাতীয়তার আদর্শে পদাঘাত করিয়া সাম্প্রদায়িক দলে যোগ দিলেন। কিন্তু মওলানা আজাদ ঐ দুর্দ্দিনেও আদর্শ হইতে একটুকুও বিচ্যুত হইলেন না। তিনি "আল্ হেলালের" আদর্শে দৃঢ় থাকিয়া সকল ঝটিকা কাটাইয়া উঠিতে সক্ষম হইলেন। চারিদিকে সাম্প্রদায়িক অগ্নি জ্বলিয়া উঠিয়াছে। কোন কোন প্রদেশে অসন্তোষের কারণ নিছক অর্থনৈতিক। হয়ত কোন মন্ত্রী অথবা উচ্চ পদস্থ কর্ম্মচারী তাঁহার আত্মীয় বন্ধু-বান্ধবকে কোন একটা চাকরী প্রদান করিয়াছেন, অথবা নিজের স্বধর্ম্মের কোন ব্যক্তিকে একটুকু সুনজরে দেখিয়াছেন, আর অমনি অন্য সম্প্রদায়ের মনে ঈর্ষা ও বিদ্বেষের বহ্নি জ্বলিয়া উঠিল। দেশের এইরূপ অশান্তিময় দিনে এই মনোভাব আরও গুরুতর আকার ধারণ করিল। হয়ত কোথায় ঋণ ভারগ্রস্ত দরিদ্র মুসলমান অর্থশালী হিন্দু জমিদার ও মহাজনের বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়াইয়াছে, আর সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মান্ধগণ ইহাকে 'ইশু' করিয়া চারিদিকে

দাবানল জ্বালাইয়া দিল। প্রত্যেক ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের চাঁইগণ বিনা কারণে, অথবা সামান্য কারণে অপবের ধর্ম্মানুভূতিতে আঘাত করিয়া দেশময় অসন্তোষ বিস্তাব করিল। হৃদয় পরিবর্ত্তন না কবিয়া,কেবলমাত্র সংখ্যা বাড়াইবার জন্য ছলে বলে কৌশলে একদল অপরকে নিজ নিজ ধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার জন্য পুবাদমে প্রচাব কার্য্য চালাইতে লাগিল। মুসলমানগণ "তবলিগের" দাবী কবিয়া হিন্দুকে ইসলামে দীক্ষা দিতে লাগিল। আব হিন্দুগণও "শুদ্ধির" দাবী কবিয়া দীক্ষিত মুসলমানকে পুনরায় হিন্দু ধর্ম্মে আনয়ন করিবাব চেষ্টা কবিতে লাগিল। ইহা ব্যক্তি স্বাধীনতার ব্যাপাব। এ অধিকার সকলেরই সকল সময় আছে। কিন্তু যেখানে সাম্প্রদায়িক মনোভাব বিদ্বেষে পূর্ণ হইয়া আছে, সেখানে এই ধবণের অধিকাব লইয়া দাঙ্গা হাঙ্গামা হইতে বাধ্য, সুতবাং অবিলম্বে দেশেব নানা স্থানে এক দলের সহিত অপর দলের সংঘর্ষ বাধিতে লাগিল। নানা স্থানে বীভৎস আকাবে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধিয়া গেল। বিভিন্ন দলের সংবাদপত্র চুপ কবিয়া বহিল না—তাহারা অনেকেই ইন্ধন যোগাইতে লাগিল। সাম্প্রদায়িক নেতারা বেনামীতে বহু ইশ্‌তেহার বিলি করিয়া এই অনলে ফুৎকাব দিতে লাগিলেন। কিছুদিন অপ্রতিহত গতিতে এই সব চলিল। অতঃপর কংগ্রেসেব নেতারা একে একে কারাগার হইতে বাহির হইলেন। তাঁহারা বাহির হইয়া সমগ্র দেশকে এই অবস্থায় পতিত দেখিলেন। তাঁহাবা অশ্রুপ্লুত নয়নে দেখিলেন যে,তাঁহাদের এত দিনের প্রাণপাত সাধনা পণ্ডশ্রম হইয়াছে। লুণ্ঠন, অগ্নি সংযোগ, পবিত্র স্থানের অবমাননা, নবহত্যা,নারী হরণ—এই সব যখন অপ্রতিহত ভাবে চলিয়াছে—ঠিক সেই সময় মহাত্মা গান্ধী কারাগার হইতে বাহিরে আসিলেন।

সাম্প্রদায়িক ভাবাপন্ন হিন্দু ও মুসলমান গান্ধীজীকে চাপিয়া ধরিল— তুমি আমাদের সর্ব্বনাশ করিয়াছ। হিন্দু বলিল: "তুমি মুসলমানকে অযথা প্রশ্রয় দিয়াছ। তুমি মুসলমানের খেলাফতের পক্ষ হইয়া তাহাদেব অভিযোগের সহিত আমাদেরকে মিলিত করিয়া তাহাদের বাড় বাড়াইয়া দিয়াছ। তাহারা ধর্ম্মের নামে একতাবদ্ধ হইতে চলিয়াছে,—তাহারা জাগিয়াছে। আর এখন খেলাফতের চূড়ান্ত মীমাংসা হইয়া যাওয়ার পর জাগরিত মুসলমান হিন্দুদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করিয়াছে।" অন্যদিকে মুসলমান বলিল: "তুমি আমাদের সর্ব্বনাশ করিয়াছ। আমরা সরল প্রকৃতির লোক, আমাদেরকে ভুলাইয়া বিপথে লইয়া গিয়াছ। আমাদের প্রতি তোমার স্বজাতিরা অন্যায় ব্যবহার করিয়াছে। তুমি আন্দোলন করিয়া আজাদ, মহম্মদ আলি, শওকত আলিকে হাত করিয়া লইয়াছ। তুমি তাহাদের সাহায্যে সার সৈয়দ আহমদের সাধের আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়কে আক্রমণ করিয়াছ। তুমি ব্যবস্থাপক সভা বর্জ্জন করিতে বলিয়া আমাদের সুযোগ্য লোককে সেখানে যাইতে দাও নাই। তাহাতে আমাদের চরম ক্ষতি হইয়াছে।" গান্ধীজী ধীরভাবে এই সকল অভিযোগের উত্তর দিলেন। কিন্তু কে শুনে কাহার কথা? অতঃপর তিনি হিন্দু-মুসলিম বিবাদের কারণ বিশ্লেষণ করিয়া একটি ঐতিহাসিক প্রবন্ধে ঘোষণা করিলেন: "আমি যাহা করিয়াছি তাহার জন্য একটুমাত্র অনুতপ্ত নহি। যদি আমি ভবিষ্যৎদর্শী হইতাম এবং সাম্প্রদায়িক কলহের জন্য যাহা ঘটিয়াছে তাহা যদি পূর্ব্বাহ্নে সমস্তই অবগত হইতাম, তবুও আমি খেলাফতের প্রশ্নে অকুণ্ঠিত চিত্তে ঝাঁপাইয়া পড়িতাম। জনসাধারণের জাগরণ আমার শিক্ষার

একটা প্রধান অংশ। ইহাই আমাব চবম লাভ। আমি জনসাধারণকে পুনবায় ঘুম পাড়াইবার কিছুই করিব না।” এই প্রবন্ধ প্রকাশের কিছুদিন পরে কোহাটে একটা ভীষণ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হইল। তাহাতে উভয় সম্প্রদায়ের বহু লোক নিহত হইল, এবং বহু লক্ষ টাকাব সম্পত্তি বিনষ্ট হইল। এই নিদারুণ ঘটনায় গান্ধীজী মর্ম্মান্তিক যাতনা অনুভব কবিলেন। তিনি ইহার জন্য প্রায়শ্চিত্ত কবিতে মনস্থ করিলেন। ১৯২৪ সালে ১৮ই সেপ্টেম্বব তাবিখে তিনি ঘোষণা কবিলেন: “লোকে না জানিয়া যে পাপ কবিয়াছে তাহাদের হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা কবিবাব জন্য আমি বক্তাক্ত হৃদয়ে একুশ দিন উপবাস দ্বাবা প্রায়শ্চিত্ত কবিব।” তাঁহাব এই সঙ্কল্পে দেশেব চাবিদিকে বিষাদেব ঘন ছায়াপাত হইল। সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানেব জন্য বহু গণ্যমান্য নেতা দিল্লীতে আগমন কবিলেন। তাঁহাবা একটি ঐক্য-সম্মিলনীর ব্যবস্থা করিলেন। পণ্ডিত মতিলাল নেহরু তাহার সভাপতি নির্ব্বাচিত হইলেন। এই ঐক্য-সম্মিলনী স্থিব কবিল—দেশেব সমস্ত অবস্থা বিবেচনা করিয়া একটি সর্ব্ববাদী-সম্মত সমাধান আবিষ্কার করিবেন। হিন্দু, মুসলমান ও অন্যান্য সম্প্রদায়েব প্রায় দেড়শত জন প্রতিনিধি এই সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। সভার কাজ কয়েকদিন ধরিয়া চলিল। কয়েকটি প্রস্তাবও গৃহীত হইল। কিন্তু ইহা সাম্প্রদায়িকতা প্লাবিত দেশে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। কারণ সভার কতকগুলি সদস্য প্রস্তাব ও পাল্টা প্রস্তাব দ্বারা সভার শান্ত বাতাসকে বিষাক্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন, অনেকগুলি প্রয়োজনীয় সমস্যাকে ধামাচাপা দিতে চাহিয়াছিলেন। ছিল না সেখানে

বাণী। তাঁহার সেদিনকার বক্তৃতা নিঃসন্দেহভাবে প্রমাণ করিল যে, তিনি ভারতের মধ্যে একজন বিশিষ্ট শ্রেণীর বক্তা। তাঁহার সে বক্তৃতায় যুক্তি, উদারতা, ধর্মের মূল তত্ত্ব সম্বন্ধে সঠিক ধারণা ও বাগ্মীতা পরিপূর্ণ ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। তিনি মুসলমানদেরকে উপলক্ষ্য করিয়া যে আবেদন করিলেন তাহাতে এই সভার মোড় ফিরিয়া গেল। তিনি তাহাদিগকে স্মরণ করিতে বলিলেন যে, গোবধ,—কি খাইবার জন্য, কি কোরবানীর জন্য—ইসলাম ধর্মের মৌলিক অঙ্গ নহে। তিনি হিন্দুদেরকে বলিলেন যে, দেশ হইতে গোবধ একেবারে বন্ধ হওয়া সম্ভব নহে। তিনি আরও বলিলেন যে, এমন বহু মুসলমান আছে যাহারা গোমাংস খায় না, এবং তাহারা মুসলমানদের মধ্য হইতে ইহা হ্রাস করিতে চেষ্টা করিতেছে। তাঁহার আবেদনে মুসলমান প্রতিনিধিগণ বিচলিত হইলেন। কিন্তু তাঁহারা প্রস্তাবের শেষ অংশটি গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইলেন না। সভাপতি সভার কাজ মুলতবী রাখিলেন, এবং যাহাতে উভয় সম্প্রদায় পরস্পরের পরামর্শ করিয়া যাহা হয় একটা কিছু প্রস্তাব গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। কিছুক্ষণের জন্য সমস্ত আবহাওয়াটি মেঘাচ্ছন্ন বলিয়া মনে হইল। অবশেষে মওলানা আজাদের আবেদন পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের হৃদয়দেশ অভিভূত করিয়া দিল। তিনি সভার এই দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার মধ্যে দাঁড়াইয়া ঘোষণা করিলেন: "হিন্দুগণ গোবধ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করার অংশটির উপর আর জোর দিবে না। তাহা উঠাইয়া দেওয়া যাইতে পারে।" সঙ্গে সঙ্গে সভাগৃহের মধ্যে একটা তুমুল হর্ষধ্বনি উত্থিত হইল। সভার পরবর্ত্তী কাজ সহজতর হইয়া আসিল। এতক্ষণ ধরিয়া অধিকারের প্রশ্ন লইয়া যে

বাদানুবাদ হইতেছিল, এইবার বুঝা গেল দায়িত্ব পালন না করিলে সে অধিকারের কোন মূল্য নাই।

ইহার পর মহাত্মা গান্ধী একুশ দিন ব্যাপী উপবাস ভঙ্গ করিলেন। বহু মুসলিম নেতা তাঁহার পার্শ্বে আসিলেন। ঐক্য-সম্মিলনীর সাফল্যে প্রীত হইয়া তিনি দুর্ব্বল কণ্ঠে বলিলেন, "ভগবানের ইচ্ছা যে কি তাহা আমি জানি না। আজিকার দিনে অনুরোধ করি—আপনারা শপথ গ্রহণ করুন যে, আমরা হিন্দু মুসলমানের ঐক্যের জন্য প্রাণপাত করিব।" হাকিম আজমল খাঁ ও মওলানা আজাদ বলিলেন, "আমরা প্রস্তুত আছি।" হায়! আজ হাকিম সাহেব আমাদের মধ্যে নাই। কিন্তু মওলানা আজাদ হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য সাধনের জন্য প্রাণপাত করিতেছেন। উভয় সম্প্রদায়কে এক করিবার জন্য সেতুস্বরূপ যাঁহারা দাঁড়াইয়া আছেন, আজ সারা ভারতে তাঁহাদের সংখ্যা খুব কম। মওলানা আজাদ তাঁহাদের মধ্যে একজন। লাঞ্ছনা, গঞ্জনা সব অকাতরে সহ্য করিয়া মৈত্রীর বন্ধন দৃঢ় করিবার জন্য তিনি আজিও পর্ব্বতের মত অটলভাবে দাঁড়াইয়া আছেন। কিন্তু হায়! গান্ধীজীর উপবাস, ঐক্য সম্মিলনীর প্রয়াস—সবই বুঝি ব্যর্থ হইতে চলিয়াছে। আজিও সে বিবাদের পরিসমাপ্তি হয় নাই। আজ তাহা অধিকতর মারাত্মক আকার ধারণ করিয়া দেশকে পশ্চাতের দিকে লইয়া যাইতেছে। ইহাতে হতাশ হইবার কারণ নাই। মহাত্মা গান্ধী, মওলানা আজাদ, চিত্তরঞ্জন দাশ, জওয়াহরলাল নেহরু, সুভাষচন্দ্র যে আদর্শের প্রতীক তাহা সহজে ব্যর্থ হইবে না, এই আমাদের একান্ত ভরসা।

ইহার পর কিছুদিন মওলানা আজাদ নীরবে আত্মসন্ধান করিতে

ঐক্যমত নাই বা হইল, কিন্তু তাই বলিয়া ঝগড়া ও কথা-কাটাকাটি করিয়া লাভ নাই। তিনি নিজে কোন দলের অন্তর্ভুক্ত হইলেন না। দুই দলের মধ্যে কাজের একটা যোগাযোগ স্থাপন করা সম্ভব কি না, তাহা লইয়া বহু নেতার সহিত আলোচনা করিলেন। এই ব্রত গ্রহণ করিয়া তিনি প্রাণপণে সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিলেন। কোন পক্ষে যোগ না দেওয়াতে তিনি দুই দলের শ্রদ্ধা ও ভক্তি পাইলেন। পণ্ডিত মতিলাল নেহরু তাঁহার শক্তিতে চরম বিশ্বাসী ছিলেন। উভয় দলের আশ্বাস পাইয়া তিনি সর্ব্বান্তঃকরণ দিয়া কাজের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। আলোচনা করিবার জন্য কখন কখন তাঁহাকে ভারতের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্তে যাইতে হইয়াছিল। উক্ত দুই দল ব্যতীত আর একটি দল ছিল জমিয়েতুল-উলামা। এই দল প্রথমে ঘোষণা করিলেন যে, ব্রিটিশ সরকারের সহিত সকল প্রকার সহযোগতা করা পাপ। তাঁহারা আবার সেই সরকারের অধীনস্থ আইন-সভাতে যোগ দিবার পক্ষে মত দিতে স্বীকৃত হইলেন না। আলেমদের প্রভাবশালী নেতারা ঘোষণা করিলেন যে, যাহা শয়তানী শাসকবর্গের সৃষ্টি, সেখানে তাঁহারা দেশকর্ম্মীগণকে আসন লইতে অনুমতি দিতে পারেন না। এই আলেম সম্প্রদায় কংগ্রেসের গয়া অধিবেশনে তাঁহাদের উক্ত বিশ্বাস পাস করাইয়া লইলেন। মনে হইল এই ধর্ম্মীয় বাধা বিদ্যমান থাকা পর্য্যন্ত উক্ত দুই দলের মধ্যে কোন আপোষ হইতে পারে না। কিন্তু কংগ্রেসের অন্য দল পরিবর্ত্তনের প্রচণ্ড সমর্থক ছিলেন। এই দুই দলের মতপার্থক্য বিরোধে পরিণত হইতে চলিল। দল ছাড়াছাড়ি হইবার উপক্রম হইল। কিন্তু এই দুঃসময়ে মওলানা আজাদ উভয় দলকে বিচ্ছেদের হাত হইতে

রক্ষা করিলেন। তাঁহাব যুক্তিক্ষমতা, বাগ্মীতা, ও dialectical পদ্ধতির অপূর্ব্ব কৌশলে এযাত্রা কংগ্রেসকে দ্বিধা বিভক্ত হইতে দিলেন না।

এই সমস্যাব সমাধানেব জন্য কংগ্রেসের একটি বিশেষ অধিবেশনের প্রয়োজন হইল। মওলানা আজাদই ইহার সভাপতি নির্ব্বাচিত হইলেন। ১৯২৩ সালেব ১৫ই সেপটেম্বর তাঁহাব সভাপতিত্বে দীল্লিতে কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন হইল। তাঁহাব অভিভাষণে তিনি আপোষের একটি 'ফবমুলা' উপস্থিত কবিলেন: "যাঁহাবা আইন-সভায় প্রবেশ কবিবার নীতিতে বিশ্বাসী তাঁহাবা সে অধিকাব পাইবেন। তাঁহাদেব কর্ত্তব্য হইবে—তাঁহারা যেন আইনসভা অধিকাব কবিয়া ভিতব হইতে বাধা দিতে থাকেন। কিন্তু যাঁহাবা এই প্রোগ্রামে বিশ্বাস কবেন না, তাঁহাবাও কংগ্রেসেব মধ্যে থাকিয়া কংগ্রেসেব গঠনমূলক কার্য্য কবিতে থাকিবেন। মওলানা আজাদেব এই 'ফবমুলা' সকলেই সন্তুষ্ট চিত্তে গ্রহণ কবিল। এই সময় কংগ্রেসেব সর্ব্বপ্রথম পার্লামেণ্টাবী প্রোগ্রাম বচিত হইল। কংগ্রেসের এই অধিবেশনে মওলানা আজাদ অতুলনীয় সূক্ষ্ম বাজনীতিজ্ঞান ও বাস্তবদৃষ্টিব পবিচয় দিয়াছিলেন। তিনি অভিভাষণেব মধ্যে ঘোষণা কবিলেন: আমি জানি যে, আইন-সভায় প্রবেশেব প্রোগ্রাম আমাদিগকে অধিক দূব লইয়া যাইবে না। আমার দৃষ্টি সব সময় ভবিষ্যতের উপব নিবদ্ধ। একদল প্রভাবশীল কংগ্রেসনেতা ও কর্ম্মীব মধ্যে পার্লামেণ্টারী মনোবৃত্তি প্রবেশ করিয়াছে। আমার মনে হয়, সাক্ষাৎ কর্ম্ম পবিকল্পনাব (direct action) অন্য কোন প্রোগ্রাম উপস্থিত না থাকাতে এই পদ্ধতিব সাহায্যে কিছু কাজ করিবার সুযোগ দেওয়া সঙ্গত।" উক্ত অধিবেশনে আইনসভায় প্রবেশের অধিকার, না দিলে

কংগ্রেসের অবস্থা কি দাঁড়াইত, ভাল হইত কি মন্দ হইত, আজ তাহা আলোচনা করা বৃথা। কিন্তু মওলানা আজাদেব ফবমুলা কংগ্রেসেব একটা মস্ত উপকার কবিল। তাহা এই যে, উহা কংগ্রেসকে দুইটি বিবদমান দলে বিভক্ত হইতে বাধা দিয়াছে। দুই দলে বিভক্ত হইলে জনসাধারণের মধ্যে একটা গভীব অবসাদ আসিত। পরবর্ত্তী যুগে কংগ্রেসকে বৃহত্তব ক্ষেত্রে পার্লামেন্টারী প্রোগ্রাম গ্রহণ কবিতে হইয়াছে। কংগ্রেস নেতাগণ উক্ত প্রোগ্রাম হইতে যথেষ্ট শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা লাভ কবিয়াছেন। ইহা অস্বীকাব করা যায় না।

ইহাব কিছুদিন পর ব্রিটিশ সবকাব ভাবতবর্ষকে অধিকতব বাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তান্তর কবিবাব ইচ্ছা ঘোষণা কবেন। কংগ্রেসের আন্দোলনেব প্রভাবেই যে তাঁহাদেব মনোবৃত্তিব কিছু পরিবর্ত্তন হয, তাহা কেহই অস্বীকাব করিতে পারে না। ব্রিটিশ সবকাব স্থিব কবিলেন যে, স্যাব জন সাইমনেব নেতৃত্বে একটি বাজকীয় কমিশন ভারতে প্রেবণ করিবেন। কিন্তু ব্রিটিশ সরকাব ভাবতের কাহাকেও এই সাইমন কমিশনে স্থান দিলেন না। ইংলণ্ডেব সাতজন লোক লইয়া স্যার জন সাইমন কমিশন ভাবতে পদার্পণ কবিলেন। আশ্চর্য্যেব বিষয় এই যে, যাহাদের ভাগ্যনিয়ন্ত্রণের জন্য এই কমিশন আসিল, তাহাদের কোন প্রতিনিধি সেখানে রহিলেন না। ইহা প্রত্যেক ভারতবাসীর আত্ম-সম্মানে আঘাত করিল। সেই জন্য দেশেব সর্ব্বশ্রেণীর জননেতা সাইমন কমিশনকে বয়কট কবিলেন। ইংলণ্ডের যুবরাজকে বয়কট করার মতই এই বয়কট সফল হইয়াছিল। কতকগুলি নবাব-সুবা, সবকার-পূজক মডারেট ব্যতীত আর কেহই ইহাকে কোনওরূপ

সাহায্য করে নাই। ব্রিটিশ সরকারের এই আচরণ আইন-সভায় প্রবেশ-পন্থী কংগ্রেস নেতাদের মধ্যে বিক্ষোভ সৃষ্টি করিল। পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর আইন-সভা প্রবেশের মোহ বহু পূর্ব্বে কাটিয়া গিয়াছিল। তিনি এক্ষণে সাক্ষাৎ সংগ্রাম করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। তাঁহার সভাপতিত্বে কলিকাতায় কংগ্রেসের বাৎসরিক অধিবেশনে ব্রিটেনকে এই মর্ম্মে একটা চরম পত্র দেওয়া হইল যে, এক বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষকে ডোমিনিয়ান ষ্টেটাস দেওয়া হউক। ১৯২৯ সালে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি প্রস্তাব করিল যে, সমস্ত কংগ্রেস সদস্যগণকে বিভিন্ন আইন সভা হইতে পদত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিতে হইবে। পর বৎসর কংগ্রেসের লাহোর অধিবেশনে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব গৃহীত হইল। কিন্তু কেবল পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব গ্রহণ করিলেই চলিবে না। সঙ্গে সঙ্গে সংগ্রামমূলক কর্ম্মপরিক্রমা গ্রহণ করা দরকার। তাই গান্ধীজীর নেতৃত্বে আইন অমান্য আন্দোলনের মূল নীতি গৃহীত হইল। লাহোর অধিবেশনের সভাপতি পণ্ডিত জওয়াহারলাল নেহরু একটি আবেগপূর্ণ আবেদন দ্বারা দেশবাসীকে লক্ষ্য করিয়া ঘোষণা করিলেন: "পূর্ণ স্বাধীনতা না পাওয়া পর্য্যন্ত আমরা ক্ষান্ত হইব না।" কংগ্রেসের এই অধিবেশনের পর হইতে আইন অমান্য আন্দোলনের বাণী চারিদিকে জ্বলন্ত আঙ্গারের মত ছড়াইয়া পড়িল। সমগ্র দেশ একটা মহা সংগ্রামের সম্মুখে উপস্থিত হইল।

এই মহা পরীক্ষার সময় মুসলমানগণ কোথায় গেল? যাহারা হাজারে হাজারে খেলাফত্ আন্দোলনে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিল, তাহারা কোথায় গেল? সত্য বটে, আইন অমান্য আন্দোলনের সময় বহু মুসলমান উহাতে

যোগ দিয়াছিল, এবং প্রায় চৌদ্দ হাজার মুসলমান কারাবরণ করিয়াছিল, কিন্তু সম্প্রদায় হিসাবে তাহাদের অনেকেই পিছাইয়া পড়িয়াছিল। ১৯২৪ সাল হইতে আলি ভ্রাতৃদ্বয় ধীরে ধীরে কংগ্রেস হইতে সরিয়া পড়িতেছিলেন। যদিও তাঁহারা লাহোর অধিবেশনে যোগদান করিয়াছিলেন, তবুও তাহাতে কোন অংশ গ্রহণ করেন নাই। তাঁহারা বরং গান্ধীজীকে এই বলিয়া সাবধান করিয়াছিলেন যে, কংগ্রেসের আইন অমান্য অভিযানে মুসলমানগণের সহযোগিতা ব্যতীত কংগ্রেসের পক্ষে আইন অমান্য সংগ্রাম ঘোষণা করা মহা ক্ষতির কারণ হইবে। ডাক্তার আন্সারী বরাবরই কংগ্রেসের পক্ষে ছিলেন। কিন্তু তিনি আইন অমান্যের ব্যাপারে খুব উৎসাহ দেখান নাই। মওলানা হসরৎ মোহানী, মওলানা জাফর আলি প্রমুখ কংগ্রেস-ভাবাপন্ন নেতাগণ আইন অমান্য আন্দোলনকে সম্পূর্ণভাবে অনুমোদন করেন নাই। তাঁহাদের এরূপ মনোভাবের একটা গূঢ় কারণ ছিল। ডাক্তার আন্সারী ব্যতীত উপরোক্ত নেতাগণ কংগ্রেসে যোগ দিয়াছিলেন খেলাফত্ উদ্ধারের জন্য, এবং সেজন্য প্রাণ বলিদান করিতেও প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু কামাল পাশা কর্তৃক খেলাফত্ পদ উৎখাত করার পর খিলাফত্ সমস্যার আর কোন গুরুত্বই রহিল না। সুতরাং তাঁহারা কিসের জন্য শুধু শুধু প্রাণ দিতে যাইবেন? তাই তাঁহারা ধীরে ধীরে কংগ্রেস হইতে সরিয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু এবিষয়ে মওলানা আজাদের আদর্শ ছিল অন্য ধরণের। তিনি দেশের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করিবার উদ্দেশ্যে কংগ্রেসে যোগদান করিয়াছিলেন। তাঁহার নিকট খিলাফত্ ছিল পরোক্ষ উদ্দেশ্য। সকলেই সরিয়া গেলেও তিনি সুদৃঢ় মুষ্টিতে কংগ্রেসের পতাকা ধরিয়া রহিলেন। আইন অমান্য

আন্দোলনের সফলতা সম্বন্ধে তাঁহার মনে সামান্য মাত্র সন্দেহ জাগে নাই। তিনি কংগ্রেসের আদর্শের সফলতার জন্য সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করিলেন। এ বিষয়ে তাঁহার এতটুকুও সন্দেহ ছিল না যে, মুসলিম জনসাধারণ কংগ্রেসের ডাকে সাড়া দিবে না। কিন্তু তাহাদের মধ্যে গভীর ভাবে প্রবেশ করিতে হইবে। তাহা না হইলে কোন ফল হইবে না। পরবর্ত্তী ঘটনার দ্বারা প্রমাণিত হইল যে, তাঁহার কথাই ঠিক। যেখানেই মুসলিম জনসাধারণের মধ্যে কংগ্রেস সেবিগণ প্রবেশ করিয়াছে, সেইখানেই কংগ্রেস সফলতা অর্জ্জন করিয়াছে। উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে কংগ্রেসের বাণী সুদূর পল্লী-গ্রামে প্রচারিত হইয়াছে। আইন অমান্য সংগ্রামের সময় এই প্রদেশের কয়েক সহস্র মুসলমান কারাবরণ করিয়াছে এবং অশেষ প্রকার নির্য্যাতন সহ্য করিয়াছে। আইন অমান্য আন্দোলনের সময় কংগ্রেসের অন্যতম অস্থায়ী ডিক্‌টেটার হিসাবে মওলানা আজাদকে কারাবরণ করিতে হইয়াছিল। কারাগারে যাইবার কালে তিনি ডাঃ আনসারীকে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত করিলেন। ডাঃ আনসারী এই পদ পূরণ করিতে বিন্দুমাত্র সঙ্কুচিত হন নাই। ১৯২১ সালের মতই ১৯৩০ সালের স্বাধীনতা সংগ্রাম বিরাট সম্ভাবনায় পরিপূর্ণ ছিল। লবণ আইন ভঙ্গ করিয়া যে সত্যাগ্রহ সংগ্রাম আরম্ভ হইল, তাহা নানা শাখা বিস্তার করিয়া সমগ্র দেশকে মাতাইয়া তুলিল। দেশের সর্ব্ব শ্রেণীর মধ্যে যে জাগরণ দেখা দিল, তাহা অপূর্ব্ব ও অচিন্ত্যনীয়। এই সংগ্রামে মওলানা আজাদ তাঁহার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়াছিলেন। আইন অমান্য আন্দোলন যখন পূর্ণোদ্যমে চলিতেছিল, তখন ব্রিটিশ সরকার কংগ্রেসের সহিত একটা বুঝাপড়া করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। বহু

আলোচনার পর মহাত্মা গান্ধীর সহিত বড় লাট লর্ড আরউইনের মধ্যে একটা চুক্তি হইল। তদনুসারে গান্ধীজী দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে কংগ্রেসের হইয়া যোগদান করিতে বিলাত গমন করিলেন। কিন্তু গান্ধীজীর বিলাত গমনের পূর্ব্বে কংগ্রেস আবার মাইনরিটি সমস্যা সম্বন্ধে তাহার নীতি ঘোষণা করিল। আর এই নীতি প্রণয়নে মওলানা আজাদের প্রেরণা ছিল সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। কংগ্রেস ঘোষণা করিল: "কংগ্রেস মনে করে যে, কেবল জাতীয় পন্থাতেই সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান হইবে। কংগ্রেস হিন্দু, মুসলমান, শিখ, খৃষ্টান ও অন্যান্য মাইনরিটি সম্প্রদায়কে এই আশ্বাস দিতেছে যে, পরবর্ত্তী যে কোন শাসনতন্ত্রে যদি সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায়গণকে নিরাপত্তার পূর্ণ প্রতিশ্রুতি না দেয় এবং যদি সকল সম্প্রদায়কে তাহা সন্তোষ দিতে না পারে, তবে কংগ্রেস তাহা স্বীকার করিবে না। দেশের বর্ত্তমান অবস্থা লক্ষ্য করিয়া কংগ্রেস একটা সাময়িক সিদ্ধান্ত রচনা করিতেছে, তাহা অবিমিশ্র জাতীয়তা ও অবিমিশ্র সাম্প্রদায়িকতার মধ্যে একটা আপোষরফা মাত্র।" কংগ্রেসের এই প্রস্তাব মুসলিম লীগের চৌদ্দ দফার ক্ষতিকর বহু দাবী স্বীকার করিয়াছে। সাম্প্রদায়িক সমস্যা সম্বন্ধে কংগ্রেসের একটা সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া মহাত্মা গান্ধী গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করিলেন। তিনি ডাক্তার আনসারীকে জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের প্রতিনিধি হিসাবে সঙ্গে লইয়া যাইতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু সাম্প্রদায়িক মুসলিম নেতাদের অন্যায় জেদের জন্য তাঁহাকে সঙ্গে লইতে পারেন নাই। গান্ধীজীর সাম্প্রদায়িক মিলনের সকল প্রকার উদ্যম কি ভাবে ব্যর্থ হইল সরকার নানা প্রকার কৌশল জাল বিস্তার করিয়া কেমনভাবে গোলটেবিল বৈঠকের সমস্ত

আবহাওয়াকে বিষাক্ত করিয়া তুলিলেন, সে সব বিষয় আমাদের আলোচনার বাহিবে। বস্তুতঃ গোলটেবিল বৈঠকে ইংরাজ বণিকদেব প্রতিনিধিগণ এই সম্পর্কে যাহা কবিয়াছেন তাহা সমগ্র ব্রিটিশ জাতিব সততাব উপর কলঙ্ক-বেখাপাত কবিবে। বহু যুগ ধবিয়া যে ভেদনীতি ব্রিটিশ সরকারের ভারত-শাসনের প্রধান নীতি ছিল, গোলটেবিল বৈঠকে তাহাকেই তাঁহাবা সর্ব্ব প্রকারেই কাজে লাগাইয়াছিলেন। উহার ফলাফলেব কথা চিন্তা করিয়া ব্রিটিশ বণিকদেব প্রতিনিধি বেনথাল সাহেব আনন্দে বিভোর হইয়া বলিতেছেন :—"মিঃ গান্ধী বিক্ত হস্তে ভাবতে ফিবিয়া আসিলেন। সাধারণ নির্ব্বাচনেব পর সরকাবেব দক্ষিণ পন্থীগণ স্থিব কবিল যে, কংগ্রেসকে ভাঙ্গিয়া দিতে হইবে, এবং গোলটেবিল বৈঠকে কংগ্রেসেব সহিত সংগ্রাম কবিবে। মুসলমানগণ ইউবোপীয়ানদের সুদৃঢ বন্ধু হইয়াছেন। মুসলমানগণ তাহাদের সুবিধাব জন্য পবম সন্তুষ্ট হইয়াছে, এবং আমাদেব সহিত একযোগে কাজ করিতে প্রস্তুত হইয়াছে। মুসলমানগণ ঠিকই আছে। মাইনরিটিদেব প্যাক্ট ও ইহার প্রতি সবকারেব বন্ধুভাব আমাদিগকে ইহাব নিশ্চয়তা সম্বন্ধে আশ্বাস দিতেছে।" এইভাবে বাজন্যবর্গ ও মাইনবিটিগণ দেশেব সাধারণ স্বার্থে জলাঞ্জলী দিয়া নিজেদেব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্য দেশদ্রোহিতা কবিতে কুণ্ঠিত হন নাই। সত্য সত্যই গান্ধীজীকে বিক্ত হস্তে ফিরিয়া আসিতে হইয়াছে। কিন্তু জিজ্ঞাসা কবি, ইহাতে কাহাব উপকার হইয়াছে? ইহাতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বন্ধনই দৃঢ হইয়াছে এবং মুসলমান বা অন্যান্য মাইনবিটিদের কোন উপকাব হয় নাই।

এই সব ঘটনা হইতে মওলানা আজাদের সাম্প্রদায়িক সমস্যা সম্পর্কে

মনোভাব লক্ষ্য করা দরকার। তিনি কোনও দিন স্বীয় আদর্শ হইতে বিচ্যুত হন নাই। মুসলমানদের সুবিধার নামে তিনি কোনও দিন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের পক্ষভুক্ত হন নাই। কিছু দিন পরে ডাক্তার আনসারী পরলোক গমন করেন। তাঁহার মৃত্যুতে একজন শ্রেষ্ঠতম জাতীয়তাবাদী মুসলমান ভারতের রাজনীতি হইতে অপসারিত হইলেন। মওলানা আজাদ তাঁহার মৃত্যুতে বড়ই নিঃসঙ্গ অনুভব করিলেন। অবশ্য আর কয়েকজন জাতীয়তাবাদী মুসলমান তাঁহার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন, কিন্তু ডাঃ আনসারীর অভাব তাঁহারা পূরণ করিতে পারিলেন না। সাম্প্রদায়িক নেতাগণ মুসলমান সমাজকে যতই জাতীয় সংগ্রাম হইতে ভাঙ্গাইয়া আনিতে লাগিল, ততই মওলানা আজাদের জাতীয় আদর্শের উপর বিশ্বাস দৃঢ় হইতে লাগিল। তাঁহার স্পষ্ট প্রতীতি হইল যে, প্যাক্ট ও আপোষ-রফার দ্বারা সাম্প্রদায়িক সমস্যার কোন স্থায়ী সমাধান হইবে না। তিনি বুঝিলেন যে, ভারতবর্ষ যাবৎ ব্রিটিশের প্রভাব হইতে মুক্ত না হইবে, তাবৎ সাম্প্রদায়িক সমস্যার কোনও রূপ সমাধান হইবে না। হিন্দু ও মুসলমান ঐ দুই সম্প্রদায়কে তাহাদের ভাগ্যের উপর ছাড়িয়া দিলেই তাহারা নিজেদের সকল সমস্যার সমাধান করিয়া লইবে।

পরবর্ত্তী ঘটনা অতি সংক্ষেপে বলিব। মহাত্মা গান্ধীর লণ্ডন হইতে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন, দ্বিতীয় সত্যাগ্রহ সংগ্রাম, লর্ড ওয়েলিংডনের পীড়নমূলক শাসন, গান্ধীজী ও মওলানা আজাদের কারাবরণ, সহস্র সহস্র স্বেচ্ছাসেবকদের আত্ম বলিদান, সত্যাগ্রহ প্রত্যাহার—এইভাবে বহু ঘটনা দুই বৎসরের মধ্যেই ঘটিয়া গেল। দেখিতে মাত্র দু'এক

বৎসর; কিন্তু ভারতের ইতিহাসে ইহা নবযুগ সৃষ্টি করিয়াছে। এই সব যুগান্তকারী ঘটনার মধ্যে মওলানা আজাদ চরম কংগ্রেস-সেবী হইয়া রহিলেন। অনমনীয় দৃঢ়তা লইয়া ও মুসলমান সমাজের নিন্দাগ্লানি সহ্য করিয়া তিনি নবযুগ সৃষ্টি করিতে আত্ম নিয়োগ করিলেন।

গঠনমূলক কার্য্য

১৯৩৫ সালের ভাবত আইন ভারতবর্ষে প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসন প্রবর্ত্তিত কবিয়াছে। কিন্তু তাহা নামেই স্বায়ত্বশাসন। ইহা ক্ষমতার সাব অংশ দেশেব প্রতিনিধিদেব হস্তে ছাড়িয়া দেয় নাই। গবর্ণবগণই সকল বিষয়েব চবম প্রভু হইয়া রহিলেন। কিন্তু তৎসত্বেও কংগ্রেস কেন মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করিতে সম্মত হইল তাহা আলোচনাব ক্ষেত্র ইহা নহে। মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করার পর মওলানা আজাদের কর্ম্মতৎপরতার কথাটাই এখানে আলোচনা করিব। ১৯৩৭ সালে মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করাব পব কংগ্রেস একটি পার্লামেণ্টাবী সাব-কমিটি নিযুক্ত করিল। তিন জন চিব পবীক্ষিত, বিশ্বস্ত ও সুদক্ষ ব্যক্তিকে লইয়া ইহা গঠিত হইল :—মিঃ বল্লভভাই প্যাটেল (চেয়াবম্যান), মওলানা আজাদ ও ডাঃ বাজেন্দ্রপ্রসাদ। এই তিন জনের সম্বন্ধে আমেরিকাব একজন লোকপ্রিয় সাংবাদিক মিঃ গান্থাব (Gunther) বলিয়াছেন :—"সাব-কমিটিব সদস্য আজাদ হইতেছেন a part of the brain and spiritual enlightenment of the Congress , ডাঃ বাজেন্দ্র প্রসাদ হইতেছেন heart of the Congress এবং প্যাটেল হইতেছেন the ruthless fist of the Congress।" সাব-কমিটির প্রধান কাজ হইল কংগ্রেস মন্ত্রীদেরকে পরিচালনা করা এবং আইন সভাব সদস্যগণ জনসাধারণকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন তাহা যাহাতে যথাযথ ভাবে প্রতিপালিত করেন তাহা সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য কবা এবং কর্ত্তব্যচ্যুত হইলে তাঁহাদিগকে ঠিক পথে পরিচালিত

করা। ইহার জন্য দরকার ছিল সুপরিকল্পিত গঠনমূলক কার্য্য-পরিক্রমা, দক্ষতা, বিভিন্ন সদস্যদের মধ্যে শৃঙ্খলা রক্ষা করিবার কৌশল, কঠোর নিরপেক্ষতা ও নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী। সাব-কমিটির এই তিনজন সদস্যই কম-বেশী এই সব গুণের অধিকারী। তাঁহাদের প্রত্যেকেই সুস্থির বুদ্ধি, মুক্ত হৃদয় ও সহযোগিতার মনোভাব দ্বারা কাজ করিয়া থাকেন। সাব-কমিটি একটা বিরাট দেশের ভার গ্রহণ করিয়াছিল বলিয়া কাজের শৃঙ্খলা রক্ষা করিবার জন্য প্রত্যেক সদস্যকে এক একটা অঞ্চলের ভার দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহারা যাহা করিতেন তাহা সংযুক্ত দায়িত্বেই করিতেন। নিম্নে কেবল মওলানা আজাদের কর্ম্মতৎপরতার কথা বলিব।

মওলানা আজাদ অসাধারণ পণ্ডিত, চিন্তাশীল, কূটনীতিজ্ঞ। ইহা হইতে অনেকের ধারণা হইতে পারে যে, তিনি গঠনমূলক কাজের অযোগ্য। কিন্তু বহু ক্ষেত্রে তিনি তাঁহার গঠনমূলক কার্য্যের দক্ষতা প্রদর্শন করিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে ১৯২৬-২৭ সালে কলিকাতার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় তাঁহার গঠনমূলক কার্য্য-দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। সেই দারুণ দিনে গুণ্ডারা অস্ত্রশস্ত্র লইয়া নরহত্যা করিবার জন্য প্রকাশ্য রাজপথে চলাফেরা করিত। যে কেহ শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করিত, তাহাকে প্রাণ হাতে লইয়াই বাহিরে যাইতে হইত। এই দুঃসময়ে মওলানা আজাদ নির্ভীকভাবে কলিকাতার সর্ব্বত্র ঘুরাফিরা করিতে লাগিলেন। কোথাও হিন্দু দলকে একতা ও শান্তির জন্য আবেদন করিতেছেন, কোথাও মুসলমানদের সহিত তর্ক বিতর্ক করিতেছেন। এই ভাবে প্রাণপণ করিয়া দাঙ্গার কেন্দ্রকে সীমাবদ্ধ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। এই সময়ের এক দিনের ঘটনার কথা উল্লেখ করিয়া

মওলানা আজাদ শ্রীযুক্ত মহাদেব দেশাইকে বলিতেছেন :—"একটি হিন্দুদের ঘন বস্তীতে কতকগুলি মুসলমান দর্জ্জি প্রত্যহ বহুদূর হইতে আসা যাওয়া করিত। এবং এই ভাবে তাহাদের জীবিকা নির্ব্বাহ হইত। দাঙ্গার দিনে একটি হিন্দু গৃহে ৬০।৭০ জন মুসলমান দর্জ্জি আশ্রয় লইতে বাধ্য হয়। গুণ্ডাগণ চারিদিকে প্রবল বেগে ঘুবাঘুবি কবিতেছিল বলিয়া তাহারা বাহিরে আসিতে সাহস করে নাই। এই সব মুসলমানদের জীবনবক্ষা কবিয়াছে বলিয়া আমি স্থানীয় হিন্দুদেবকে ধন্যবাদ দিলাম। আমি তাহাদিগকে মটবগাড়িতে রাখিয়া বাড়ী পঁহুছাইয়া দিবার ব্যবস্থা কবিলাম। মুসলমান পল্লীতে কতক-গুলি হিন্দু এইরূপ অবস্থায় পড়িয়াছিল। একজন মুসলমান তের জন হিন্দুকে আশ্রয় দিয়াছিল, তন্মধ্যে এগার জন ছিল পুরুষ এবং দুইজন ছিল স্ত্রীলোক। সেই গভীব বাত্রে কোথাও ঘোড়া গাড়ী পাওয়া গেল না। করপোবেশনের নিকট ট্যাক্সির জন্য আবেদন করিলাম। ট্যাক্সি পাওয়া গেলে তাহাদিগকে উহাতে রাখিলাম ও তাহাদের স্ব স্ব বাড়ীতে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিলাম। দিবারাত্র তিন দিন আমার আরাম ও শান্তির অবসব হয় নাই। একদিন মধ্যরাত্রে আসানসোল হইতে প্রেবিত একটি পত্র পাইলাম। তাহাতে লিখিত ছিল যে, "কতকগুলি লোক দুই দিন হইল আসানসোল হইতে কলিকাতা অভিমুখে রওয়ানা হইয়াছে, কিন্তু তাহাদের কোন সংবাদ পাওয়া যাইতেছে না।" আমি তাহাদের খুঁজিয়া বাহির করিলাম। তাহাদের আত্মীয়গণকে সংবাদ দিলাম, এবং যাহাতে তাহারা নিরাপদে বাটী পঁহুছিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিলাম।" মওলানা সাহেব এইভাবে নানা স্থানের ক্ষুদ্র বৃহৎ বহু সমস্যা অতি নিখুঁতভাবে সমাধান করিয়া

দিয়াছেন। যুক্ত প্রদেশে সিয়া-সুন্নি বিবাদ মিটাইয়া দিবার জন্য তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছিলেন। এবং এই সমস্তার সমাধানের জন্য তিনি যে পন্থার নির্দ্দেশ কবেন, তাহাই বর্ত্তমান অবস্থায় সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। মধ্য প্রদেশে বিদ্যামন্দির পরিকল্পনার বিরুদ্ধে একদল মুসলমান যে তুমুল আন্দোলন করিতে থাকে তাহা তাঁহাবই হস্তক্ষেপের ফলে শান্ত হয়।

কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী সাব-কমিটিব সদস্যের ক্ষমতা বলে তিনি যাহা করিয়াছেন, তাহা বিহার প্রদেশেব হাজাব হাজাব কৃষক প্রজাদেব উপকার করিবে। এজন্য তাহারা তাঁহার নিকট চিবকৃতজ্ঞ থাকিবে। কংগ্রেসী মন্ত্রীত্বের যুগে তিনি যে কৌশল ও দক্ষতা সহকাবে বিহার প্রদেশের জমিদারদের ক্ষমতা হ্রাস করিয়াছেন তাহা তাঁহাব গঠন ক্ষমতার পরিচয় প্রদান করে। কংগ্রেসেব নির্ব্বাচনী ইশতেহারে জনসাধাবণকে একটি প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছিল যে, কৃষকদের জন্য নানা বিষয়ে সুবিধাজনক আইন প্রণয়ন করা হইবে। কিন্তু কৃষকদের সহিত জমিদারদেব চিরকাল ধরিয়া একটা অহিনকুল সম্বন্ধ বিদ্যমান ছিল। কৃষকদের ভাল করিতে গেলেই জমিদারগণ তাহাতে বাধা দিত। যুক্ত-প্রদেশটাও বিহারের মত জমিদার প্রভাবিত অঞ্চল। এখানেও কৃষক-জমিদারদের নানা সমস্যা দেখা দিয়াছিল। প্রজাস্বত্ব আইনেব সংশোধনের নাম শুনিয়া বিহারেব জমিদারগণ একটি ডেপুটেশন ১৯৩৭ সালের অক্টোবর মাসে কলিকাতায় কংগ্রেস্ নেতাদের নিকট সাক্ষাৎ করিবাব জন্য প্রেরণ করিলেন। তখন ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ কলিকাতায় ছিলেন। ডেপুটেশন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিল। ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ বুঝিলেন, জমিদার ও কৃষকদের মধ্যে একটা সন্তোষজনক

মীমাংসা করিতে হইলে মওলানা আজাদের সাহায্য বিশেষ প্রয়োজনীয়। ডেপুটেশন তৎক্ষণাৎ মওলানা আজাদের সহিত সাক্ষাৎ করিল। তিনি তাহাদের সমুদয় অভিযোগ শ্রবণ করিয়া এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় সমস্ত কথা জ্ঞাত হইবার জন্য অবিলম্বে পাটনা যাইতে সম্মত হইলেন। তিনি পাটনা গমন করিয়া কয়েকদিন তথায় অবস্থিতি করিলেন; এবং ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদের সহযোগিতায় কাজ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা উভয়ে প্রধান মন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রীদের সহিত এ বিষয়ে আলোচনা করিলেন, এবং যে সব প্রস্তাব উপস্থিত করা হইল তাহার প্রত্যেকটি পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন। জমিদারদের সহিত আলোচনা করিবার পূর্ব্বে মওলানা আজাদ সেই সব কংগ্রেস কর্ম্মীদের সহিত খোলা মনে সমস্ত বিষয় আলোচনা করিলেন। যাহারা এতাবৎ কৃষকদের স্বার্থের জন্য অক্লান্ত সংগ্রাম করিতেছিল, তাহাদের দাবীগুলি পরীক্ষা করিলেন এবং এই দাবীগুলিকে ভিত্তি করিয়া জমিদারদের সহিত আলোচনা আরম্ভ করিলেন। প্রজাদের প্রত্যেক দাবী অকাতরে মানিয়া লইবার মত মনোবৃত্তি জমিদারদের ছিল না। কিন্তু মওলানা আজাদ ও ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ প্রজাদের অধিকাংশ দাবী জমিদারগণ কর্ত্তৃক স্বীকার করাইতে সাধ্যমত চেষ্টা করিলেন।

আলোচনার সময় মাঝে মাঝে বহু কঠিন ও অদ্ভুত প্রশ্ন আসিয়া উপস্থিত হইত। তাহা আপোষ-রফার পথে প্রবল অন্তরায় সৃষ্টি করিত। মওলানা আজাদ একটা মৌলিক আদর্শের উপর জমিদারগণকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে বলিলেন। তিনি বলিলেন যে, প্রজাদের যুগ যুগ ব্যাপী অসুবিধাগুলি এরূপ ভাবে দূর করিতে হইবে যেন তাহারা দেহে ও আত্মায় স্বাচ্ছন্দ্য

উপভোগ করিতে পারে। জমিদারগণ এই নীতি স্বীকার করিয়া লইল। কিন্তু তার পর প্রশ্ন উঠিল শতকরা কত স্বার্থ তাহাদিগকে ত্যাগ করিতে হইবে। প্রচলিত আইন অনুসারে একজন জমিদার তাহার প্রজাকে সর্ব্বস্বান্ত করিতে পারিতেন, তাহার ভিটে, ঘর, বাড়ী, জমি ইত্যাদি সমস্তই কাড়িয়া লইতে পারিতেন। কিন্তু ন্যায় নীতি ও প্রজা কল্যাণের আদর্শ একবার স্বীকার করিলে তাঁহারা কেমন করিয়া প্রজাদের জমি, ঘর, বাড়ী বাকী খাজনার দায়ে নিলাম করিয়া লইতে পারেন? অধিকাংশ ক্ষেত্রে সম্পত্তির আসল মূল্য অপেক্ষা বহু কম মূল্যে জমিদারগণ প্রজাদের সম্পত্তি নিলাম করিয়া লন। প্রথমে মনে হইল, ইহারই জন্য বুঝি সব আলোচনা ফাঁসিয়া যাইবে। মওলানা আজাদ এ বিষয়ে আলোচনা করিবার জন্য প্রধান মন্ত্রীকে আইন সভা মুলতবি রাখিতে অনুরোধ করিলেন এবং অনমনীয় জমিদারগণকে ন্যায় নীতি ও উদারতার দোহাই দিয়া আবেদন করিলেন—তাঁহারা যেন প্রত্যেকটি কাজ মুক্ত হৃদয়ে করেন। তাঁহারা এক হাতে যাহা দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন অন্য হাতে যেন তাহা কাড়িয়া না লন। তাঁহার এই আবেদন ব্যর্থ হইল না। এবং তাঁহার আবেদনের নৈতিক ফল হাতে হাতে পাওয়া গেল। আইন পাস হইবার পূর্ব্বে কতক ব্যাপারে জমিদারগণ এমন ব্যবহার করিতে লাগিলেন যেন আইন পাস হইয়া গিয়াছে। বিহার প্রজাস্বত্ব আইন প্রজাদের ষোল আনা দাবী গ্রহণ করে নাই। কিন্তু প্রজাগণ বহু বিষয়ে জমিদারদের কবল হইতে রক্ষা পাইয়াছে। সর্ব্বত্র শতকরা পঁচিশ টাকা খাজনা হ্রাস হইয়া গিয়াছে। কোন কোন ক্ষেত্রে ৪০ হইতে ৫০ টাকা পর্য্যন্ত খাজনা হ্রাস হইয়াছে।

প্রজাগণ এমন কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ সুবিধা পাইয়াছে, যাহা তাহাদিগকে প্রকৃত প্রস্তাবে জমিব মালিক করিয়া দিয়াছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে কর ব্যতীত জমিদারদের সঙ্গে তাহাদের অন্য কোন সংশ্রব নাই। তাহাদের অস্থাবব, ঘব বাড়ী প্রভৃতি ক্রোক করিবার পথ বন্ধ হইয়াছে। বাকী খাজনার দায়ে এ সব নিলামে বিক্রয় হইবে না। এবং কোন দখলি সম্পত্তি সমগ্রভাবে নির্ব্যূঢ় স্বত্বে বিক্রীত হইবে না। সম্পত্তিব সেই অংশটুকু যাহা দেনা পরিশোধেব জন্য যথেষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইবে, তাহাই বিক্রীত হইতে পারিবে। কিন্তু ইহাব মূল্য সরকাব স্থানীয় অবস্থা বিবেচনা কবিয়া যাহা নির্দ্ধাবণ করিয়া দিবেন, তাহাই ধার্য্য হইবে। বাকী খাজনার জন্য যদি জমিদার প্রজার কোন জমি নিলাম বিক্রয় কবিতে চান, তবে প্রজা সেই জমির পরিপূর্ণ মূল্য প্রাপ্ত হইবে। তা ছাড়া প্রজাগণ ইচ্ছামত জমি বিক্রয় করিতে পারিবে। অথবা অন্যভাবে হস্তান্তব করিতে পারিবে। জমিদার সম্পত্তির হস্তান্তব স্বীকার কবিতে বাধ্য হইবে। প্রজা তাহার হস্তান্তরিত জমি ও সংরক্ষিত জমিব মধ্যে খাজনাব হার নির্দ্ধারণ করিবার জন্য জমিদারকে সামান্য মাত্র ফিঃ দিয়া বাধ্য কবিতে পাবিবে। প্রজাগণ স্ব স্ব জমির উপর ঘর বাড়ী বাগান কূপ ইত্যাদি নির্ম্মাণ কবিবার পূর্ণ অধিকার প্রাপ্ত হইবে। বাকী খাজনাব দায়ে তাহারা কোনও মতে উচ্ছেদ হইবে না। সুতবাং তাহারা প্রকৃত প্রস্তাবে জমিদারদের প্রভাব হইতে মুক্ত হইয়াছে। এই আপোষের ফলে আর একটা আশু উপকার হইয়াছে। জমিদার ও সরকারের মধ্যে একটা বুঝাপড়া না হইলে জমিদারদের উপর কৃষি-কর স্থাপন কষ্টকব ছিল। কৃষি-করের প্রশ্ন সর্ব্ব প্রথম বিহাবে

দেখা দিল। কিন্তু মওলানা আজাদ ও ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদেব হস্তক্ষেপের ফলে এ বিষয়েও একটা আপোষ-রফা হইয়া গেল। এবং আইন দ্বারা সর্ব্ব প্রথম বিহারে কৃষি-কর স্থাপন করা সম্ভব হইল। জমিদাবগণ বিনা বাধায় ইহা আইন সভায় পাস হইতে দিয়াছিলেন। এই কৃষি-কব তাঁহাদের উপর বাৎসরিক ৪০ লক্ষ হইতে ৫০ লক্ষ টাকার বোঝা চাপাইয়াছিল। খাজনা বাবতে জমিদারগণকে বহু টাকা ত্যাগ করিতে হইয়াছে। আর খাজনা কমাতে প্রজাদেব দুই হইতে আড়াই কোটি টাকা লাভ হইয়াছে।

এই সব ব্যাপারে মওলানা আজাদ কিরূপ সাহায্য করিয়াছিলেন তাহা ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদেব উক্তি হইতে উদ্ধৃত কবিতেছি :—"জমিদার ও প্রজাদের সহিত আপোষ আলোচনাব সময় মওলানা আজাদেব তীক্ষ্ণ দূরদর্শিতা ও অপরকে বুঝাইবার শক্তিব চরম পবিচয় পাওয়া যায়। প্রথমে তাঁহাকে একটা অসুবিধার মধ্যে পড়িতে হইয়াছিল, তাহা এই যে, বিহাবের প্রজাস্বত্ব আইনের বিস্তৃত বিববণ তিনি জানিতেন না। কিন্তু আলোচনাব সঙ্গে সঙ্গে তিনি এই জটিল আইনেব নানা তথ্য জানিয়া ফেলিলেন। এবং দ্রুত সিদ্ধান্তে আসিতে সমর্থ হইলেন। সবচেয়ে বেশী আশ্চর্য্য এই যে, তিনি অপরকে তাঁহাব মতে আনিতে অদ্ভুত ক্ষমতা দেখাইলেন। প্রথমবার কয়েকদিন ধবিয়া দীর্ঘ আলোচনা হইল এবং অধিকাংশ বিষয় স্থিব হইয়া গেল। পরে মওলানাকে কয়েক দিনেব জন্য পাটনায় আসিতে হইল, এবং বহু আলোচনার পর কংগ্রেস ও জমিদারদের মধ্যে একটা আপোষ হইয়া গেল। আমরা ইচ্ছা করিয়া কৃষাণ সভাকে এই আলোচনা হইতে দূরে বাখিয়াছিলাম। ভবিষ্যতে দরকার হইলে আবও আন্দোলন করিবার

সুযোগ হইতে তাহাদিগকে বঞ্চিত করি নাই। এই আপোষের মধ্যে তাহাদিগকে লইলে তাহাদের দ্বারা আর আন্দোলন করা চলিত না। আমরা বুঝিলাম যে, জমিদারদের সম্মতি লইয়া আইন পাস করিতে গেলে প্রজাদের জন্য যে সব প্রতিকার পাইবার আশা করিয়াছিলাম তাহা পাইতে বিলম্ব হইত। জমিদারদের সহিত আপোষ হইবার কয়েক মাসের মধ্যে উক্ত আইন পাশ হইয়া গেল। প্রজাস্বত্ব আইন ও আয়কর আইন সম্বন্ধে বিভিন্ন দলের সহিত আলোচনা করিবার সময় মাঝে মাঝে মনে হইত সব বুঝি ফাঁসিয়া যাইবে। কারণ কোন দলই সর্ব্ববাদী সম্মত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিতেছিলেন না, তখন মওলানা আজাদের অসাধারণ দক্ষতা, আবেদন করিবার পদ্ধতি ও অপরকে বুঝাইবার অপার ক্ষমতা সমস্ত অবস্থাকে ঠিক পথে পরিচালিত করিয়াছে। বস্তুতঃ তাঁহার গঠনমূলক ক্ষমতা অদ্ভুত। আর এই ক্ষমতার বলেই তিনি কংগ্রেসের বিভিন্ন দলের মধ্যে সংহতি রক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছেন।”

রামগড়ে—রাষ্ট্রপতির অভিভাষণ

মওলানা আজাদ ত্যাগ, নিষ্ঠা ও সাধনাব বলে ভারতের হিন্দু-মুসলমান নির্ব্বিশেষে সকলেবই অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও ভালবাসা পাইয়া আসিতেছেন। আর তাহাবই ফল স্বরূপ ১৯৩৯ সালে সমগ্র জাতি তাঁহাকে রাষ্ট্রপতি নির্ব্বাচিত কবিয়াছে। বামগডে সভাপতিব আসন হইতে তিনি যে যুক্তিপূর্ণ অভিভাষণ দিয়াছিলেন তাহা জাতির নির্ব্বাচন যে ভুল হয় নাই তাহাই প্রমাণিত কবিল। এই অভিভাষণটি মওলানা আজাদের বৈশিষ্ট্যে পরিপূর্ণ। কঠোব যুক্তিপূর্ণ কথায় তিনি গাঁথিয়াছেন একটি মালা; সময়ের প্রয়োজনীয় বিষয়েব উপব দৃষ্টি তাঁহাব নিবদ্ধ। তিনি সর্ব্বত্র আডম্ববিহীন—এবং অবান্তর বিষয় পবিহাব করিতে সিদ্ধহস্ত। পাটনায় ওয়ার্কিং কমিটি স্থির করিয়াছিল যে, সেবার কংগ্রেসেব পক্ষ হইতে একটি মাত্র প্রস্তাব উপস্থাপিত হইবে। এবং মওলানা আজাদ স্থিব করিয়াছিলেন যে, তিনিও একটি মাত্র বিষয়কে তাঁহাব অভিভাষণে বিস্তাবিত ভাবে আলোচনা কবিবেন। ইহাব একটি অনুচ্ছেদ অতিবিক্ত ছিল না—একটি শব্দ বৃথা ব্যয়িত হয় নাই। সর্ব্বত্র একটা ধীর, সংযত ও গভীব ভাব বিদ্যমান। এই মূল্যবান অভিভাষণের সাবাংশ নিম্নে দেওয়া হইল।

১৯১২ সালে যখন "আল্ হেলাল" প্রথম প্রকাশিত হয়, তখন মওলানা আজাদ দেশবাসীকে আন্তর্জ্জাতিক ঘটনাবলী পাঠ করিতে বলিয়াছিলেন। তাঁহার মতে আন্তর্জ্জাতিক অবস্থা ঠিকভাবে জ্ঞাত না হইলে মুসলমানের

তথা ভারতের কোন সমস্যাই সম্যক বোধগম্য হইবে না। কংগ্রেস ১৯৩৬ সালে পণ্ডিত জওয়াহরলাল নেহরুর সভাপতিত্বে ভারতবাসীকে বিশ্ব-পরিস্থিতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কাজ করিতে নির্দ্দেশ দেয়। কংগ্রেসের এই নীতি মওলানা আজাদের বহু পূর্ব্ব ঘোষিত আদর্শের পরিণতি। এই অভিভাষণে মওলানা আজাদ এই নীতিকে পূর্ণভাবে সমর্থন করিয়াছেন। তিনি বলেন: "কংগ্রেসের ইতিহাসে ১৯৩৬ সালের লক্ষ্ণৌ অধিবেশন একটা নূতন আদর্শের ইঙ্গিত দিয়াছে। উক্ত অধিবেশনে কংগ্রেস আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে একটা দীর্ঘ প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছিল, এবং জনসাধারণের সম্মুখে ইহার সুচিন্তিত অভিমত পরিষ্কারভাবে ও দ্বিধাহীন চিত্তে প্রকাশ করিয়াছে। অতঃপর আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতি ও তৎসম্পর্কে প্রস্তাব গ্রহণ করা কংগ্রেসের বাৎসরিক ঘোষণার একটা প্রধান ও অপরিহার্য্য বিষয় হইয়া পড়িয়াছে। এই সম্পর্কে কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত জগতের নিকট ঘোষিত হইয়া আসিতেছে। এই সব প্রস্তাব একই সঙ্গে বিশ্বের নিকট দুইটি বিষয় ঘোষণা করিতেছে। প্রথমতঃ—আমাদের বর্ত্তমান অসহায় অবস্থা সত্ত্বেও আমরা আর ভারতের বাহিরের নিখিল বিশ্বের রাজনীতি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিতে চাহি না। আমরা যখন আগে চলিতে থাকিব, এবং আমাদের ভবিষ্যৎ গড়িতে থাকিব, তখন আমরা কেবলমাত্র আমাদের চতুঃপার্শ্বে সীমাবদ্ধ হইয়া থাকিব না, বহির্জ্জগতের অবস্থার প্রতি কঠোর দৃষ্টি রাখিব। আজ নানাবিধ পরিবর্ত্তন পৃথিবীর নানা দেশ ও জাতিকে পরস্পরের নিকট করিয়াছে। জগতের এক প্রান্তে চিন্তা ও কর্ম্মের যে তরঙ্গ উঠিবে, তাহা অবিলম্বেই অন্য প্রান্তে প্রভাব বিস্তার করিবে। সেই জন্য

কেবল নিজের চতুঃসীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া ভারতের সমস্যা বিবেচনা করা অসম্ভব। ইহা সুনিশ্চিত যে, বহির্জ্জগতের ঘটনাবলীর প্রতিক্রিয়া ভারতকেও প্রভাবিত করিবে। ঠিক এই ভাবে আমাদের সিদ্ধান্ত ও অবস্থা অবশিষ্ট জগতকেও প্রভাবিত করিবে। এই জ্ঞান ও বিশ্বাসবশতঃ আমরা আন্তর্জ্জাতিক বিষয়ক প্রস্তাব ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছি। আমরা এই সব ঘোষণার দ্বারা ফ্যাসিজম ও নাৎসিজমের মত প্রতিক্রিয়াশীল আন্দোলনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছি—যে ফ্যাসিজম ও নাৎসিজম গণতন্ত্র, ব্যক্তিগত এবং জাতিগত স্বাধীনতার বিরুদ্ধে তাহাদের সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করিয়াছে। এই সব আন্দোলন দিন দিন শক্তি সঞ্চয় করিতেছে। আর ভারতবর্ষ এগুলিকে সমগ্র জগতের উন্নতি ও শান্তির পক্ষে ভয়ানক শত্রু বলিয়া মনে করিয়া থাকে। আজ সমগ্র ভারতবর্ষ তাহাদের সহিত একমত যাহারা গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছে, এবং এই প্রতিক্রিয়াশীল মতবাদকে বাধা দিতেছে।"

অতঃপর মওলানা আজাদ পরিষ্কার করিয়া বলিয়াছেন: "ভারতের সংগ্রাম ব্রিটিশ জাতির বিরুদ্ধে নয়; ইহা যেমন নাৎসিবাদের বিরুদ্ধে— সেইরূপ ইহা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধেও। আমরা নাৎসিবাদ ও ফ্যাসিষ্টবাদ হইতে উৎপন্ন বিপদের কথা চিন্তা করিতেছি বটে, কিন্তু পুরাতন বিপদ যাহা এই নূতন বিপদ হইতেও জাতির শান্তি ও স্বাধীনতার পক্ষে অধিকতর গুরুতর বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে, সেই পুরাতন বিপদকে সহজে ভুলিতে পারি না। এই পুরাতন ব্যাধিই নূতন ব্যাধির জন্ম দিয়াছে;—তাহা হইতেছে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ। নূতন প্রতিক্রিয়াশীল আন্দোলনকে আমরা

দূর হইতে দেখিতেছি। কিন্তু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের আমরা নিষ্ক্রিয় দর্শক নহি। ইহা আমাদেব সম্মুখেই বহিয়াছে—আমাদের গৃহাদি অধিকাব করিয়াছে, এবং আমাদেব উপব প্রভুত্ব কবিতেছে। এই জন্য আমবা পরিষ্কাব ভাবে ঘোষণা করিয়াছি যে, যদি ইউরোপীয় শক্তিপুঞ্জের গৃহবিবাদ কোন যুদ্ধ বাধাইয়া থাকে, তাহা হইলে ভারতবর্ষ—যাহাকে তাহাব নিজেব ইচ্ছা প্রকাশ কবিতেও স্বাধীন মত প্রকাশ করিতে বাধা দেওয়া হইয়াছে—সেই ভাবতবর্ষ এই যুদ্ধে কোন অংশ গ্রহণ কবিবে না। যোগ দিবার প্রশ্ন ভারতবর্ষ তখনই বিবেচনা কবিবে, যখন নিজেব স্বাধীন ইচ্ছা ও নির্ব্বাচন অনুসারে এতৎসম্পর্কে সিদ্ধান্ত করিবার অধিকাব সে পাইবে। ভারতবর্ষ কোনমতেই নাৎসিবাদ ও ফ্যাসিষ্টবাদ সহ্য কবিবে না। কিন্তু একথাও সত্য যে, ভাবতবর্ষ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ দ্বাবা ভয়ানক উত্যক্ত হইয়াছে। ভাবতবর্ষ তাহাব স্বাভাবিক স্বাধীনতার অধিকাব হইতে বঞ্চিত। ইহাব সহজ অর্থ এই যে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ তাহার সমুদয় ঐতিহাসিক সাম্রাজ্যবাদসুলভ বৈশিষ্ট্যেব উপব দাঁড়াইয়া থাকিতে চায়। এমত অবস্থায় ভারতবর্ষ কোনমতেই স্বেচ্ছাক্রমে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের জয়েব জন্য সহযোগিতার হস্ত প্রসাবিত কবিবে না। ইহাই হইতেছে কংগ্রেসের দ্বিতীয় ঘোষণা। আর কংগ্রেস তাহার বিভিন্ন প্রস্তাব দ্বারা পুনঃ পুনঃ এই ঘোষণা কবিয়াছে। লক্ষ্ণৌ অধিবেশনের পর হইতে ১৯৩৯ সালেব আগষ্ট পর্য্যন্ত এই সব প্রস্তাব বহুবাব গ্রহণ কবা হইয়াছে। এবং এইগুলি কংগ্রেসের "সমর-প্রস্তাব" বলিয়া খ্যাতিলাভ কবিয়াছে।"

অতঃপর মওলানা আজাদ বলিতেছেন : "কিন্তু ইহা ব্রিটিশ

সবকারেব ইচ্ছাব প্রশ্ন নহে। সহজ ও সরল প্রশ্ন হইতেছে—ভারতের অধিকার—তাহার নিজেব ভাগ্য নিজের দ্বারা নির্দ্ধারণ কবিবার অধিকার আছে কি না। এই প্রশ্নের উত্তরের উপর আজিকার সমস্ত প্রশ্নের উত্তর নির্ভর করিতেছে। এই প্রশ্ন ভারতের সমস্যার ভিত্তিমূল। ভাবতবর্ষ এই ভিত্তিমূল অপসাবিত হইতে দিবে না। কাবণ ইহা অপসাবিত হইলে ভারতেব জাতীয়তার সমস্ত কাঠামো ধূলিসাৎ হইয়া যাইবে। বর্ত্তমান সমবেব প্রশ্ন সম্বন্ধে আমাদেব অবস্থা অত্যন্ত পবিষ্কাব। গত মহাযুদ্ধের মত এই যুদ্ধেও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যেব মূর্ত্তি পরিষ্কাব ভাবে দেখিতেছি। আমরা এই যুদ্ধে অংশ গ্রহণ কবিয়া তাহাদেব বিজয়ে সাহায্য করিতে প্রস্তুত নহি। আমাদেব দাবী কাচেব মত স্বচ্ছ। আমরা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে বিজয়লাভ কবিতে ও শক্তিশালী হইতে দেখিতে ইচ্ছা কবি না। এই ভাবে সাহায্য করিয়া আমাদেব পরাধীনতার কালকে দীর্ঘস্থায়ী কবিতে চাহি না। আমাদেব পথ বিপবীত দিকে।” এই আলোচনার শেষে মওলানা আজাদ বলিতেছেন: “যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর ব্রিটিশ ক্যাবিনেটের কতিপয় সদস্য জগতকে বিশ্বাস করাইতে চাহিয়াছিলেন যে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রাচীন পদ্ধতি শেষ হইয়াছে এবং আজ শান্তি ও সুবিচার ব্যতীত ব্রিটিশ জাতির অন্য কোন উদ্দেশ্য নাই। এই ঘোষণা যদি সত্য হইত, তাহা হইলে ভাবতবর্ষই সর্ব্বপ্রথম ইহাকে আগ্রহের সহিত গ্রহণ কবিত। কিন্তু প্রকৃত কথা এই যে, এই ধরণের ঘোষণা সত্ত্বেও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ শান্তি ও সুবিচারের পথেই বাধা স্বরূপ দাঁড়াইয়া আছে। যুদ্ধের পূর্ব্বেও তাহার আচরণ ঠিক এই ধরণেরই ছিল। ভারতের দাবীই

হইতেছে এই ঘোষণার আন্তরিকতা যাচাই করিবার কষ্টিপাথর। ভারতের দাবীব দ্বারা ব্রিটেনের ঘোষণা পরীক্ষিত হইয়াছে এবং দেখা গিয়াছে যে, তাহা মেকী ও অসত্য।”

মওলানা আজাদ হিন্দু-মুসলমান সমস্যা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা ইতিহাসে এক মহিমান্বিত আসন লাভ কবিবে। ১৯১২ সালে “আল হেলাল” প্রচারের সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি কবিবাব জন্য যে সব পলিসি ও প্রচেষ্টা হইয়াছে মওলানা আজাদ তাহাব বিরুদ্ধে অক্লান্ত সংগ্রাম করিয়া আসিতেছেন। এই অভিভাষণেও তিনি সেই কথাই বলিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন : “আজ আমাব সহধর্ম্মীদেরকে স্মবণ করাইয়া দিতে চাই যে, ১৯১২ সালে আমি যখন তাহাদিগকে এই ইস্তুতে আহ্বান করিয়াছিলাম, তখন আমি যেখানে দাঁড়াইয়াছিলাম আজও ঠিক সেইখানে দাঁড়াইয়া আছি। (পবিশিষ্ট দ্রষ্টব্য) সেই সময় হইতে অদ্যাবধি যে সব ঘটনা ঘটিয়াছে সে সম্বন্ধে বহু চিন্তা করিয়াছি, চক্ষু যে সব বিষয় লক্ষ্য করিয়াছে, আমার মন সে বিষয় চিন্তা কবিয়াছে। আমাব নিকট হইতে এই সব ঘটনা কেবল চলিয়া যায় নাই। আমি ইহাদের মধ্যে ছিলাম, ইহাতে অংশ গ্রহণ করিয়াছিলাম। আমি প্রত্যেকটি ঘটনা যত্ন সহকাবে বিচার করিয়াছি। আমি আমার বিশ্বাসের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে পারি না, আমাব বিবেকের বাণী রোধ করিতে পারি না। এই দীর্ঘকাল ধরিয়া যাহা বলিয়া আসিয়াছি, আমি আজ তাহারই পুনরাবৃত্তি কবিয়া বলিতেছি যে, ভাবতের নয় কোটি মুসলমানের জন্য ১৯১২ সালে আমি যে পথের দিকে আহ্বান করিয়াছিলাম, আজও সেই পথ ব্যতীত অন্য পথ নাই। (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য) ভারতের

মুসলমানগণ "মাইনরিটি"—এই কথাটি আমি স্বীকার করি না। আমার মতে কেবলমাত্র রাজনৈতিক দিক দিয়া যে দল সংখ্যালঘু তাহাদিগকে মাইনরিটি বলা চলে। এবং সেই অজুহাতে তাহারা বিশেষ সংরক্ষণ-ব্যবস্থা পাইবার হকদার নহে। "মাইনরিটির" সোজা অর্থ এই:—যে দল অত্যন্ত সংখ্যালঘু এবং এত সংখ্যালঘু যে, নিজেদেরকে রক্ষা করিতে সম্পূর্ণ অপারগ। কতকগুলি সৎগুণ ও শক্তির অভাবে এই সংখ্যালঘু দল মেজরিটিদের মধ্যে থাকিয়াও নিজেদেরকে এত অসহায় মনে করে যে, তাহারা স্বীয় স্বার্থ রক্ষা করিতে নিজেদের শক্তির উপর কোন বিশ্বাস রাখিতে পারে না। অন্য দল হইতে সংখ্যায় অল্প হইলেই কোন দল মাইনরিটি পদ বাচ্য হইবে, তাহা নহে। মাইনরিটি হইতে গেলে ইহাই দরকার যে, এই সংখ্যালঘু দল এত অল্প ও অক্ষম হইবে যে, নিজেদের স্বার্থরক্ষা করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম হইবে। সুতরাং মাইনরিটি সমস্যা কেবলমাত্র সংখ্যাল্পতার সমস্যা নহে, অন্যান্য সর্ত্ত ইহাতে থাকা চাই। যদি কোন দেশের লোকসংখ্যার দশ লক্ষ থাকে এক দলে, আর কুড়ি লক্ষ থাকে অন্য দলে, তাহা হইলে ইহা স্বতঃসিদ্ধ ভাবে বুঝায় না যে, যেহেতু এক দল অন্য দল হইতে সংখ্যায় অর্দ্ধেক, সেই হেতু এই সংখ্যাল্পদল নিজেদেরকে রাজনৈতিক মাইনরিটি দল বলিয়া মনে করিবে এবং সেই অজুহাতে নিজেদেরকে দুর্ব্বল বলিয়া ধরিয়া লইবে।"

ইহার পর কবিত্বপূর্ণ ভাষায় মওলানা আজাদ বলিতেছেন: "তার পর পূর্ণ এগার শত বৎসর গত হইয়াছে। হিন্দুর মত ভারতের বুকে ইসলামেরও দাবী জন্মিয়াছে। যদি কয়েক সহস্র বৎসর ধরিয়া

হিন্দু ধর্ম্ম ভারতের ধর্ম্ম হইয়া থাকে, ইসলামও এক সহস্র বৎসর ধরিয়া ভারতের ধর্ম্ম হইয়া গিয়াছে। যেমন একজন হিন্দু গর্ব্বের সহিত বলিতে পারে যে, সে ভারতবাসী এবং হিন্দুধর্ম্ম অনুসরণ করে, সেইরূপ আমরাও গর্ব্বের সহিত বলিতে পারি যে, আমরা ভারতবাসী এবং ইসলাম অনুসরণ করিয়া চলি। আমি সীমা আরও বাড়াইয়া দিব এবং বলিব—ভারতীয় খৃষ্টানগণ এই কথা বলিবার অধিকারী যে, তাহারা ভারতবাসী এবং খৃষ্টান ধর্ম্ম অনুসরণ করিতেছে।” সর্ব্বশেষে মওলানা আজাদ জিজ্ঞাসা করিতেছেন: “আমরা—ভারতের মুসলমানগণ—ভবিষ্যতের স্বাধীন ভারতকে সন্দেহ ও অবিশ্বাসের চক্ষে দেখিব—না, সাহস ও বিশ্বাসের সহিত দেখিব? আমরা যদি ইহাকে ভয় ও অবিশ্বাসের সহিত দেখি, তবে নিশ্চয় আমাদিগকে পৃথক পথ অনুসরণ করিতে হইবে। বর্ত্তমানের কোন ঘোষণা, ভবিষ্যতের কোন প্রতিশ্রুতি, কোনওরূপ গণতান্ত্রিক রক্ষাকবচ আমাদের এই সন্দেহ ও ভয় দূর করিতে পারিবে না। এরূপ অবস্থাতে আমাদিগকে তৃতীয় শক্তির অস্তিত্ব ও প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিতে বাধ্য হইতে হইবে। এই তৃতীয় শক্তি ইতিমধ্যে এদেশে ঘাঁটি গাড়িয়া বসিয়া আছে, এবং চলিয়া যাইবার কোন ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছে না। যদি ভয় ও অবিশ্বাসের পথ অনুসরণ করি, তাহা হইলে স্বতঃসিদ্ধভাবে আমাদিগকে এই শক্তির স্থায়িত্বের প্রতি মনোনিবেশ করিতে হইবে। কিন্তু যদি আমরা সুনিশ্চিত ভাবে বুঝি যে, আমাদের মধ্যে ভয় ও সন্দেহের কোন স্থান নাই, এবং আমরা ভবিষ্যতকে নিজেদের উপর সাহস ও বিশ্বাসের সহিত দেখিতে চেষ্টা করি, তাহা হইলে আমাদিগকে অবশ্যম্ভাবীরূপে বিভিন্ন পথে কাজ করিতে হইবে। তখন

আমরা নিজেদেরকে একটা নূতন জগতের সম্মুখে দেখিব যে, জগৎ সন্দেহের কালমেঘ হইতে মুক্ত—ইতস্ততঃ ভাব, নিষ্ক্রিয়তা ও বিরূপ মনোভাব সেখানে থাকিতে পারে না। বিশ্বাস ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞা কর্ম্ম ও প্রাণ-চাঞ্চল্যের সোনালী আলো সে জগৎ হইতে কখনও ম্লান হয় না। যুগ-বিপর্য্যয়ের প্রভাবে কত বাধা বিঘ্ন আমাদের পথে আসিবে—এসব আমাদের পদস্খলন করিতে পারিবে না। বিন্দুমাত্র সন্দেহ না করিয়া আমি এই স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি; এবং আমার শরীরের প্রত্যেক শিরা উপশিরা উপরোক্ত দুইটি পথের প্রথম পথটার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিতেছে, উহার চিন্তাও আমি সহ্য করিতে পারি না। আমি চিন্তা করিতে পারি না যে, কোনও মুসলমান ইহা সহ্য করিতে পারিবে। অবশ্য যদি সে তাহার অন্তর হইতে ইসলামের তেজ ও প্রাণশক্তিকে অপসারিত করে, তবে তাহা স্বতন্ত্র কথা।”

ব্রিটেনের যে সব ব্যক্তি “মাইনরিটি” সমস্যাকে অলঙ্ঘ্য বাধা বলিতে ক্লান্তিবোধ করেন না, মওলানা আজাদ তাঁহাদের সম্বন্ধে বলিতেছেন ঃ—“সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধানকে জাতীয় আদর্শে পহুঁছিবার প্রধান সর্ত্ত হিসাবে স্বীকার করিয়া আমরা ইহার প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব দিয়াছি। কংগ্রেস সব সময় এই বিশ্বাস পোষণ করে, কেহই কংগ্রেসের এই মনোভাবকে অস্বীকার করিতে পারে না। এই সম্পর্কে কংগ্রেস দুইটি মৌলিক-নীতি গ্রহণ করিয়াছে এবং এইগুলিকে সম্মুখে রাখিয়া কংগ্রেস অগ্রসর হইয়া থাকে ঃ—

(১) ভারতের জন্য যে কোন শাসন-তন্ত্র রচিত হউক না কেন, তাহাতে মাইনরিটিদের অধিকার ও স্বার্থের পরিপূর্ণ প্রতিশ্রুতি থাকিবে।

(২) মাইনরিটিদের অধিকার ও স্বার্থ কোন্ প্রকার রক্ষা কবচ দ্বারা সংরক্ষিত হইবে তাহা মাইনরিটিগণ নিজেরাই বিচার করিবে। ইহা মেজরিটিগণ বিচার করিবেন না। সুতরাং এতৎ সম্পর্কে সকল সিদ্ধান্ত মাইনরিটিদের সম্মতির উপর নির্ভর করিবে, মেজরিটিদের মতের উপর নহে। গণ-পরিষদ আহ্বান করিয়া সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানের জন্য কংগ্রেস যে নীতি ঘোষণা করিয়াছে তাহা উক্ত দুইটি মৌলিক আদর্শের উপর যথেষ্ট আলোকপাত করিতেছে। যথার্থ মাইনরিটিগণ যদি ইচ্ছা করে, তবে গণ-পরিষদে তাহাদের প্রতিনিধি নিজেদের সম্প্রদায়ের ভোটের দ্বারা নির্ব্বাচিত করিতে পারিবে। তাহাদের প্রতিনিধি নিজেদের সম্প্রদায় ব্যতীত অন্য কোন সম্প্রদায়ের ভোটের উপর নির্ভর করিতে হইবে না। মাইনরিটিদের অধিকার ও স্বার্থ সম্পর্কে একথা প্রযুক্ত হইবে। গণ-পরিষদে তাহাদের অধিকার ও স্বার্থ সংক্রান্ত বিষয়ের সিদ্ধান্ত মেজরিটিদের ভোটের উপর নির্ভর করিবে না। ইহা মাইনরিটিদের সম্মতি সাপেক্ষ। যদি কোন প্রশ্ন সম্বন্ধে একমত হওয়া সম্ভব না হয়, তাহা হইলে মাইনরিটিদের সম্মতি আছে এমন কোন নিরপেক্ষ আদালতের নিকট সেই সব ব্যাপার মীমাংসা করিবার ভার ছাড়িয়া দেওয়া হইবে। এই শেষ বিধি কেবলমাত্র তখনই প্রযুক্ত হইবে, যখন পরস্পরের আলোচনায় কোন সর্ব্ববাদী সম্মত মত গৃহীত হইবে না। এরূপ ক্ষেত্র খুব কমই উপস্থিত হইবে। ইহা অপেক্ষা কোনও বাস্তব পরিকল্পনা কেহ যদি রচনা করিতে পারে, তবে কংগ্রেস তাহা গ্রহণ করিতে কোনও আপত্তি করিবে না।”

অতপর মওলানা আজাদ বিস্ময়ের সহিত জিজ্ঞাসা করিতেছেন . “ব্রিটেনের

সহিত ভারতের কোন বুঝাপাড়া কি একেবারেই অসম্ভব? জগতের এই দুইটি জাতি যাহারা শাসক ও শাসিত এই দুই সম্বন্ধ দ্বারা আবদ্ধ, তাহারা কি যুক্তি, সুবিচার ও শান্তির ভিত্তিতে একটা নূতনতর সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারে না? যদি তাহা সম্ভব হয়, তবে বর্ত্তমান বিশ্ব-সমর সঞ্জাত দুঃখের স্থানে নব-জাত আশা আসিয়া স্থান লাভ করিবে, এবং যুক্তি ও বিচারের নব বিধান ও নব প্রভাতের জন্ম দিবে। আজ যদি ব্রিটেন জগতকে সগৌরবে ঘোষণা করিতে পারে যে, সে ইতিহাসে একটা নূতন অধ্যায় যোগ করিয়াছে, তাহা হইলে মানব জাতির পক্ষে একটা বিরাট ও অভূতপূর্ব্ব বিজয় সূচিত হইবে। ইহা অসম্ভব নয়। কিন্তু ইহা কঠিন কাজ।”

রামগড়ে এই বৎসর একটা দুর্য্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার মধ্যে কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। অবিরাম বৃষ্টিধারার মধ্যে প্রথম দিনের কাজ আরম্ভ হইল। কিন্তু মওলানা আজাদ বৃষ্টি ও ঝটিকাকে অগ্রাহ্য করিয়া একটি সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা দিয়া সভার কার্য্য আরম্ভ করিলেন, এবং ঘোষণা করিলেন যে, প্রস্তাব ও সংশোধনী প্রস্তাব পর দিন আলোচিত হইবে। কিন্তু পর দিনও আকাশে দুর্য্যোগ লাগিয়াছিল। প্রকৃতির এই দুর্য্যোগ অগ্রাহ্য করিয়া মওলানা আজাদ কংগ্রেসের পঞ্চাশ হাজার লোক লইয়া সভার কার্য্য চালাইতে লাগিলেন। এই হাজার হাজার লোক আনন্দ ও দৃঢ়তার সহিত বৃষ্টি ও ঝটিকার সম্মুখীন হইল। মওলানা আজাদ যদি তাড়াতাড়ি সংশোধনী প্রস্তাবগুলিকে সারিয়া ফেলিতেন, তাহা হইলে কোন ক্ষতিই ছিল না। কিন্তু প্রস্তাবকারীকে তিনি অবসর দিয়াছিলেন। এইভাবে চারি

ঘণ্টার মধ্যে সভার কাজ শেষ করিলেন। সমস্ত সংশোধনী প্রস্তাব বাতিল হইয়া গেল। এবং একটি মাত্র প্রস্তাব বিপুল ভোটাধিক্যে পাস হইয়া গেল।

রামগড় অধিবেশনের পর কংগ্রেস সংগ্রাম-মূলক কার্য্যপদ্ধতি গ্রহণ করিল। আইন পরিষদ ত আগেই বর্জ্জন করা হইয়াছে। তারপর আরম্ভ হইল আইন অমান্য সংগ্রাম। কিছুদিন পূর্ব্বে যাঁহারা মন্ত্রীত্ব করিয়াছিলেন, তাঁহারা দলে দলে কারাগারে যাইতে লাগিলেন। মওলানা আজাদ আইন অমান্য করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে আপত্তিকর বক্তৃতা দিবার অভিযোগে ধৃত হইয়া দেড় বৎসরের জন্য কারাগারে প্রেরিত হইলেন। প্রায় এই সময়ে পণ্ডিত জওয়াহরলাল নেহরু চারি বৎসরের জন্য কারাদণ্ড প্রাপ্ত হন। কিন্তু ব্রিটেনের সহিত আবার একটা বুঝাপড়ার কথা উত্থাপিত হয়। সেই জন্য তাঁহারা দণ্ড ভোগের পূর্ব্বেই মুক্তি প্রাপ্ত হন।

মুসলিম লীগের অভিযোগ ও তাহার স্বরূপ

মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করার পর কংগ্রেস আটটি প্রদেশে গঠনমূলক কাজ করিতেছিল। কিন্তু অধিকদিন তাহা করা সম্ভব হইল না। ইউরোপে দ্বিতীয় মহাসমর আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বময় একটা আন্তর্জ্জাতিক সঙ্কট দেখা দিল। এই বিশ্বজোড়া সঙ্কটের সময় ভারতের স্থান কোথায়? বস্তুতঃ ইউরোপীয় মহাসমর ভারতবর্ষকে রূঢ় বাস্তবতার সম্মুখে উপস্থিত করিল। মহাসমর প্রমাণ করিল যে, ১৯৩৫ সালের ভারত আইন ভারত-বাসীকে কোন ক্ষমতা দেয় নাই। বড লাট আইন সভার অনুমতি না লইয়াই ভারতবর্ষকে যুদ্ধরত দেশ বলিয়া ঘোষণা করিলেন। ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট ভারত আইনের বহু ধারাকে আপৎকালীন ব্যবস্থা বলিয়া স্থগিত করিল। সুতরাং প্রাদেশিক মন্ত্রীদের দৈনন্দিন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবার ক্ষমতা বড লাটের বাড়িয়া গেল। কংগ্রেস দেখিল—ইহাতে স্বায়ত্ব-শাসন অচল হইয়া যাইবে। নির্ব্বাচক মণ্ডলীকে যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে বর্ত্তমান অবস্থায় তাহা পালন করা সম্ভব হইবে না। মন্ত্রীত্ব করিতে গেলে সে প্রতিশ্রুতি ভাঙ্গিতে হইবে। তাই কংগ্রেস মন্ত্রীদেরকে পদত্যাগ করিবার নির্দ্দেশ দিল। কিন্তু পদত্যাগ করিবার পূর্ব্বে কংগ্রেস ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টকে বর্ত্তমান যুদ্ধের উদ্দেশ্য পরিষ্কার ভাবে বর্ণনা করিতে অনুরোধ করিল, এবং এই উদ্দেশ্য কি ভাবে ভারতের প্রতি প্রযুক্ত হইবে তাহা জানিতে চাহিল। কিন্তু ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ইহার কোন উত্তর দিল না। বরং তাহার চিরাচরিত ভেদনীতিকে

এই সুযোগে আবার জাগাইয়া তুলিল। কংগ্রেস সভাপতি মওলানা আজাদ যথার্থভাবে এই কথাব উপব জোর দিলেন। তিনি বলিলেন : "আমরা কি এতই যুক্তিহীন যে, এই যুদ্ধেব কাবণ জিজ্ঞাসা কবিতে পারিব না ?" জাতির এই দুঃসময়ে মওলানা আজাদ পন্থা নির্দ্দেশে ওয়ার্কিং কমিটিকে বাস্তব উপদেশ দিয়া নিজেব বাস্তব জ্ঞানের পবিচয় দিয়াছেন। কিন্তু ব্রিটিশ সরকার কংগ্রেসের উদ্দেশ্যকে বিকৃত রূপ দিবাব জন্য এবং নিজেদেব পলিসি প্রকাশে বিলম্ব কবিবাব জন্য সেই বহু নিন্দিত মাইনবিটি সমস্যাকে উস্কাইয়া দিলেন। ভাবতেব প্রতিক্রিয়াশীল দল ও উপদলেব যে সব কাল্পনিক অভিযোগ থাকিতে পাবে, এবং দীর্ঘকাল ভেদনীতিব অবশ্যম্ভাবী পবিণতি স্বরূপ যে সব সমস্যা উঠিতে পারে, ব্রিটিশ সবকাব সেইগুলিব প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ কবিলেন। আব এই ধরণেব মত বিশিষ্ট দলগুলিকে ও তাহাদের নেতাদেবকে কংগ্রেসেব বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়াইবাব জন্য যেন তাঁহাবা সোল্লাসে আহ্বান কবিলেন। ইহাদেব দ্বারা জগতবাসীকে ইহাই বুঝাইতে চাওয়া হইয়াছিল যে, কংগ্রেস-ভক্ত ভাবত অপেক্ষা কংগ্রেস-বিরোধী ভারতই সংখ্যাগবীষ্ঠ ও প্রধান। কংগ্রেস-বিবোধী ভারত ব্রিটিশ সরকাবের নিকট হইতে কোন ঘোষণা চাহে না। তাহারা কংগ্রেসকেই ভয় কবে এবং ব্রিটেনের আশ্রয়কে অধিকতর নিবাপদ মনে কবে। কিন্তু কংগ্রেস এই সব কৌশলে বিভ্রান্ত হইল না। কংগ্রেস দ্বিধাহীনভাবে ঘোষণা করিল যে, ভারতের সমস্ত উপাদানের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিগণের সম্মিলিত দাবীব দ্বারা যে গঠনতন্ত্র রচিত হইবে, কংগ্রেস তাহাই মানিয়া লইবে। তবে এই প্রতিনিধিগণকে পূর্ণ বয়স্ক ভোটাধিকার বা তদনুরূপ কোন

নির্ব্বাচন পদ্ধতির দ্বারা নির্ব্বাচিত করিতে হইবে। কিন্তু মুসলিম লীগ ইহাতে সম্মত হইল না। বরং লীগ-নেতারা মাইনরিটি স্বার্থের নামে কংগ্রেসের এই সঙ্গত দাবীকে বাধা দিতে লাগিলেন।

মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করিবার সময় হইতেই মুসলিম লীগ কংগ্রেসের প্রত্যেকটি কাজেই বাধা দিয়া আসিতেছিল। যখনই কংগ্রেস কোন প্রকার নিষ্পত্তির জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছে, তখনই লীগ অবাস্তব ও অসম্ভব দাবী তুলিয়া কংগ্রেসের উদ্যমকে ব্যর্থ করিয়া দিয়াছে। মুসলিম লীগ হঠাৎ দাবী করিয়া বসিল যে, কংগ্রেসকে স্বীকার করিতে হইবে যে, লীগই মুসলমানের একমাত্র প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠান, আর কংগ্রেস হিন্দু প্রতিষ্ঠান। কিন্তু কংগ্রেস এ দাবী স্বীকার করিতে পারে নাই। কারণ তাহা হইলে কংগ্রেসের গত পঞ্চাশ বৎসরের ইতিহাসকে অস্বীকার করিতে হয়। কংগ্রেস যখন মন্ত্রীত্ব করিতেছিল, তখন লীগ-নেতারা নানা মিথ্যা অভিযোগ তুলিয়া কংগ্রেসী মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করিতেছিলেন। তাঁহারা গবর্ণরগণকে আবেদন করিবার এমন কোন সুযোগ পান নাই, যাহাতে গবর্ণরগণ বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া এইসব কাল্পনিক অভিযোগ দূর করিতে পারেন। কারণ ভারত আইনে মাইনরিটি রক্ষার জন্য গবর্ণরগণের হাতে যে বিশেষ ক্ষমতা নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহা প্রয়োগ করিবার মত কোন ঘটনাই ঘটে নাই। যতদিন কংগ্রেস মন্ত্রীত্ব করিতেছিল, ততদিন লীগ নেতাগণ কেবলই হৈ চৈ করিতেছিলেন। কিন্তু কংগ্রেস যখন স্বেচ্ছায় মন্ত্রীত্ব ত্যাগ করিল, তখন কতকগুলি লীগ নেতা এই কথাই বলিয়াছিলেন যে, কংগ্রেস মন্ত্রীত্ব ত্যাগ করিয়া ভাল করে নাই। যাহাতে মন্ত্রীত্ব ত্যাগ না করে, সে জন্যও কোন

কোন লীগ নেতা আবেদন করিয়াছিলেন। কিন্তু মন্ত্রীত্ব ত্যাগের অল্পকাল পরেই মিষ্টার জিন্না "মুক্তি-দিবস" ও "ধন্যবাদ-দিবস" পালন করিবার জন্য একটি ঘোষণাপত্র প্রচার করিলেন। কারণ তাঁহার মতে মন্ত্রীত্ব ত্যাগের দিন মুসলমান সমাজ মেজরিটি শাসনের কবল হইতে মুক্তি পাইয়াছে। তিনি ইহাতেই ক্ষান্ত থাকেন নাই। ইহার কিছুদিন পরে 'রয়াল কমিশন' নিযুক্ত ও ভারত-বণ্টনের তথা পাকিস্থানের দাবী করিয়া বসিলেন। ভারতবর্ষকে দুই ভাগে বিভক্ত করিতে হইবে, এক ভাগ দেওয়া হইবে হিন্দুদেরকে ও অন্য ভাগ দেওয়া হইবে মুসলমানকে। মিষ্টার জিন্না কংগ্রেসী মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে যে সব অভিযোগ আনয়ন করিয়াছেন, তাহা শুধু কংগ্রেসের বিরুদ্ধে নহে, তাহা মওলানা আজাদের বিরুদ্ধেও বটে। কারণ কংগ্রেসী-মন্ত্রীদের বহু পলিসি তাঁহার নির্দ্দেশ ক্রমেই গৃহীত হইয়াছে। যদি এই অভিযোগগুলি সত্য হয়, তবে কংগ্রেস ক্যাবিনেটের প্রধান সদস্য হিসাবে ও পার্লামেণ্টারী সাব-কমিটির সদস্যহিসাবে মওলানা আজাদ স্বীয় ধর্ম্মসম্প্রদায়ের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার অপরাধে অপরাধী। তাহা হইলে বলিতে হইবে যে, কংগ্রেসে নিজের স্থান ও মর্য্যাদা রক্ষার জন্যই তিনি মুসলমানদের প্রতি অত্যাচার-অবিচার সহ্য করিয়াছেন। মওলানা আজাদের বিরুদ্ধে ইহা অপেক্ষা সাংঘাতিক অভিযোগ আর কিছুই হইতে পারে না। মিঃ জিন্নার আরোপিত এই সব অভিযোগ মওলানা আজাদ ধীরভাবে ও নিরপক্ষভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, এবং একটি ঐতিহাসিক বিবৃতি দিয়া তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। তাঁহার সেই বিবৃতির কিয়দংশ নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

"কংগ্রেস যখন স্বেচ্ছায় ও নিজের প্রস্তাবক্রমে আটটা প্রদেশের মন্ত্রীত্ব

ত্যাগ করিল, তখন লীগ-সভাপতির পক্ষ হইতে মুসলিম-ভারতকে দিবাব মত কি উপদেশ থাকিতে পাবে ? তাহা এই :—তাহারা দলে দলে মসজিদের পথে অগ্রসর হইবে, এবং খোদাতালা কংগ্রেসী-মন্ত্রীত্বের কবল হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করিয়াছে বলিয়া তাঁহাকে (খোদাকে) ধন্যবাদ দিবে। যে কংগ্রেস ক্ষমতা অপেক্ষা কর্ত্তব্যকে আগ্রহের সহিত বাছিয়া লইয়াছে, যে কংগ্রেস কেবল ভারতের স্বাধীনতাব ইশুতে নয়, বরং প্রাচ্য দেশের সমস্ত পদানত জাতিব অধিকাব ও স্বাধীনতার ইশুতে পদত্যাগ কবিয়াছে, সেই কংগ্রেসেব বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন কবিবার জন্য মুসলমানকে মসজিদে গিয়া খোদাকে ধন্যবাদ দিতে বলা হইয়াছে। কংগ্রেসেব সহিত তাঁহার যতই মত বিরোধ থাকুক না কেন, মুসলমান সমাজ সমগ্র জগতেব সম্মুখে নিজেদেরকে এই ভাবে চিত্রিত হইতে দিবে, ইহা কল্পনা কবিতে আমার মনে বড়ই বেদনা হইতেছে। নিজেদেব অধিকাব ও স্বার্থেব জন্য যে কোন ধবণের সংগ্রাম করিবাব পূর্ণ অধিকার মুসলমানদের আছে। ইহা তাহাদের আভ্যন্তরীণ ঝগড়া। কিন্তু যে পন্থা স্বাধীনতার বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হইতে পারে, তেমন কোন পন্থা তাহাদেব অবলম্বন করা কখনই উচিত হইবে না। কিন্তু মিঃ জিন্নার বর্ত্তমান আচরণ এই পথে মুসলমান সমাজকে লইয়া যাইতেছে। ইহার সোজা অর্থ এই যে, মুসলমানগণই ভারতেব স্বাধীনতাব পথে বাধাস্বরূপ দাঁড়াইয়া আছেন। ১৯১২ সালে এই মনোভাবের বিরুদ্ধে আমি মুসলমান সমাজকে সাবধান কবিয়া দিয়াছিলাম। (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য) সাতাশ বৎসব পরে আমাকে আবার সেই সাবধান বাণী উচ্চারণ করিতে হইতেছে দেখিয়া আমার হৃদয় ব্যথিত হইতেছে। কেন মিষ্টার জিন্না

মুসলমানদিগকে "মুক্তি দিবস" পালন করিতে বলিতেছেন ? কারণ তাহারা কংগ্রেসের অত্যাচার হইতে রক্ষা পাইয়াছে। এই অত্যাচারের পরিমাণ ও স্বরূপ কি ধরণের ? মিঃ জিন্নার মতে "কংগ্রেসী-মন্ত্রীগণ সুস্থিরভাবে পরিকল্পনা করিয়া মুসলিম-বিরোধী কার্য্য করিয়াছেন। মন্ত্রীগণ নিজেদের দায়িত্ব পালন করিতে গিয়া ও আইন প্রনয়ণ করিতে গিয়া যথাসাধ্য মুসলিম মতামতকে পদদলিত করিয়াছেন। মুসলিম সংস্কৃতি ধ্বংস করিবার জন্য তাহাদের ধর্ম্মে ও সামাজিক জীবনে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন এবং তাহাদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকারে পদাঘাত করিয়াছেন।" এক্ষণে যদি আমরা তর্কস্থলে স্বীকার করিয়া লই যে, মিঃ জিন্না যে ছবি আঁকিয়াছেন তাহা যথার্থ, তবে আমাদিগকে বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে যে, তাহা হইতে কি সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে ? ইহার সিদ্ধান্ত অতি পরিষ্কার :— আটটি প্রদেশের গবর্ণমেণ্ট ক্রমাগত মুসলমানদের সামাজিক ও ধর্ম্মীয় জীবনে হস্তক্ষেপ করিয়া আসিতেছেন, তাঁহারা মুসলমানদের সংস্কৃতি ধ্বংস করিয়া চলিয়াছেন, তাহাদের আর্থিক ও রাজনৈতিক অধিকারে পদাঘাত করিয়াছেন—আর এই সকল অত্যাচার মাত্র কয়েক দিন হয় নাই, এগুলি বিনা বাধায় দীর্ঘ আড়াই বৎসর ধরিয়া চলিয়াছে। এই অকল্পনীয় অত্যাচারের পর ভারতের আট কোটি মুসলমান সাক্ষাৎ ভাবে কি কর্ম্মপরিক্রমা অবলম্বন করিয়াছে ? দীর্ঘকাল যাবৎ তাহারা এই আশায় অপেক্ষা করিয়াছে যে, কখন স্বেচ্ছায় ও নিজের প্রস্তাবক্রমে কংগ্রেস মন্ত্রীত্ব ত্যাগ করিবে। এবং তাহাদের এই স্বপ্ন যখন পূর্ণ হইল, তখন তাহারা হৃদয়ের দ্বার খুলিয়া দিয়া খোদার নিকট ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিল এবং

বনি-ইস্‌রাইলদেব মত তাঁহাবা ঘোষণা কবিতে লাগিলেন যে, তাঁহাদের মুক্তির দিন আসিয়াছে। মিঃ জিন্না জগতের সম্মুখে ভাবতের মুসলমানদেব কি সম্মানজনক চিত্রই না আঁকিয়াছেন। এই কলঙ্কজনক চিত্র আমার পক্ষে মুসলমান হিসাবে এক মুহূর্ত্ত সহ্য করা অসম্ভব। আমি ইহা স্বীকার করিতে মোটেই প্রস্তুত নহি যে, ভারতের আট কোটি মুসলমান এতদূব অসাড় ও অসহায় হইয়া পডিয়াছে যে, তাহাদের স্ব স্ব আটটি প্রদেশের গবর্ণমেণ্ট আড়াই বৎসর যাবৎ তাহাদের ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিতে থাকিবে, তাহাদের সংস্কৃতি ধ্বংস কবিতে থাকিবে, তাহাদেব আর্থিক ও বাজনৈতিক স্বার্থ পদদলিত করিতে থাকিবে, আর তাহাবা শান্তভাবে মিঃ জিন্না বিঘোষিত "মুক্তি দিবসের" সুপ্রভাতের জন্য অপেক্ষা করিবে। ভাবতেব মুসলমানদের আত্মসম্মানের পক্ষে ইহা অপমানকব কথা। ইহা সুধার পরিবর্ত্তে তাহাদেব মধ্যে গরল প্রবেশ কবার তুল্য। এই ধবণের অত্যাচাবী গবর্ণমেণ্টকে সহ্য করিবাব দিন বহু দিন হইল চলিয়া গিয়াছে। মিঃ জিন্না যে অভিযোগ করিয়াছেন তদনুরূপ অত্যাচার করিয়া অল্প দিনের জন্যও শাসনকার্য্য পরিচালন করা আজকাল কোনও গবর্ণমেণ্টের পক্ষে সম্ভবপর নহে। তিনি (মিঃ জিন্না) স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেন যে, 'কোন ব্যতিক্রম না করিয়া প্রত্যেক কংগ্রেসী গবর্ণমেণ্ট একই ভাবে মুসলমানদের উপর অত্যাচাব করিয়াছে। আমি ঘোষণা কবিতেছি যে, যদি একজন মন্ত্রী এই প্রকার অত্যাচাব করিত, তাহা হইলে ভারতের মুসলমানদের নিশ্চয় সেই কর্ত্তব্যবোধ থাকিত, সেই জ্ঞান থাকিত, নিজেদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সেই চেতনা থাকিত যাহার জন্য তাহারা মিঃ জিন্নার

প্রস্তাবিত "মুক্তি দিবস" প্রতিপালন করিবার আশায় অপেক্ষা কবিয়া বসিয়া থাকিত না। মন্ত্রীত্ব গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই তাহারা কংগ্রেসী মন্ত্রীত্বের অস্তিত্ব কাল সীমাবদ্ধ করিয়া দিত। নিশ্চয় ভারতীয় মুসলমানগণ চেতনাহীনতা ও ভীরুতা এই দুই উপাদানে গঠিত নহে। নির্ব্বিকাব ভাবে তাহাদের ধর্ম্মীয়, সামাজিক জীবনে হস্তক্ষেপ ও অর্থ নৈতিক ও রাজনৈতিক স্বার্থে পদাঘাতকে স্বচক্ষে অনবরত দেখিবার মত ধৈর্য্য তাহাদেব থাকিত না।

"এই প্রসঙ্গে স্মরণ বাখিতে হইবে যে, মিষ্টার জিন্নাব অভিযোগ এই নহে যে, সাম্প্রদায়িক আবহাওয়া স্বচ্ছ কবিবার জন্য যাহা যাহা উচিত ছিল, কংগ্রেসী মন্ত্রীগণ তাহা কবিতে ব্যর্থ হইয়াছেন, অথবা কতকগুলি বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষ কোন প্রদেশের মুসলমানেব কতকগুলি অভিযোগ আছে, অথবা শাসন ব্যাপারে কোন কোন মন্ত্রী কতকগুলি ভুল কবিয়াছেন। যদি অভিযোগেব প্রকৃতি এইরূপ হইত, তাহা হইলে তাঁহার অভিযোগগুলি অযৌক্তিক বলিয়া বিবেচিত নাও হইতে পারিত, এবং প্রত্যেকটি অভিযোগ তদন্ত কবিবার মত ন্যায় সঙ্গত অভিযোগ বলিয়া বিবেচিত হইত। কিন্তু মিষ্টার জিন্না এই ধরণের লোক নহেন। সমগ্র কংগ্রেসী মন্ত্রীমণ্ডলীর বিরুদ্ধে সাধারণ ভাবেই এই অভিযোগ করিয়াছেন যে, কংগ্রেসী মন্ত্রীদের প্রত্যেক পলিসি ইচ্ছা করিয়াই মুসলিম বিবোধী হইয়াছে, তাঁহারা অনববত মুসলিম সংস্কৃতি ধ্বংস করিয়া চলিয়াছেন, তাঁহাবা অনবরত মুসলমানের ধর্ম্মীয় ও সামাজিক জীবনে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন এবং সর্ব্বদাই মুসলমানের আর্থিক ও রাজনৈতিক অধিকারে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। আমি পূর্ব্বেই ঘোষণা করিয়াছি এবং সমস্ত দায়িত্ব লইয়া এখনও ঘোষণা করিতেছি যে, কংগ্রেসী

মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে এই সব অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। কংগ্রেসী-মন্ত্রিগণ ইচ্ছা করিয়া মুসলিম-বিদ্বেষী পলিসি অবলম্বন করিয়াছিলেন বলিয়া যে অভিযোগ করা হইয়াছে, তাহা মিথ্যার পর্ব্বত রচনা করা ভিন্ন আর কিছুই নহে। মন্ত্রিগণ মুসলমানের ধর্ম্ম সংক্রান্ত রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক অধিকারে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন বলিয়া যে উক্তি করা হইয়াছে, তাহাও নির্জ্জলা মিথ্যা। কোন অভিযোগ প্রমাণ করিবার জন্য জগতে যে সব সাধারণ পদ্ধতি প্রচলিত আছে, মিঃ জিন্না, অথবা যাঁহারা অভিযোগ করিতে চান, তাঁহাদের উচিত সেই সকল পদ্ধতি দ্বারা কংগ্রেসী মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে তাঁহাদের আরোপিত অভিযোগ প্রমাণ করা। যদি তিনি তাহা প্রমাণ করিতে সমর্থ না হন, তাহা হইলে প্রত্যেক বিবেক সম্পন্ন মানুষ এই আশা করে যে, তিনি যেন তাঁহার রসনা ও লেখনীকে সংযত করিয়া রাখেন। বিগত দুই বৎসরের মধ্যে কংগ্রেসী মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে মুসলমানের যে সব অভিযোগ আমার গোচরে আসিয়াছে তাহার প্রতি আমার ব্যক্তিগত আচরণ বর্ণনা করিবার ইহা ক্ষেত্র নহে। পরে বিস্তারিত ভাবে আমি তাহা করিব। সংক্ষেপে আমি এই কথা বলিতে পারি যে, এই সময়ের মধ্যে যে কোন অভিযোগ আমার নিকট আসিয়াছে, আমি নিরপক্ষ ভাবে সেগুলি তদন্ত করিয়াছি। পার্লামেণ্টারী সব-কমিটির সদস্যগণ, ওয়ার্কিং কমিটির- সদস্যগণ, প্রাদেশিক মন্ত্রিগণ এবং প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির কার্য্যকরী সদস্যগণ, সকলেই জানেন যে, এই সব ব্যাপারে আমার আচরণ কিরূপ কঠোর ও আপোষহীন ছিল। কোন কোন ব্যাপারে কেবলমাত্র মন্ত্রীদের উত্তর দেখিয়া সন্তুষ্ট রহিতাম না, সংশ্লিষ্ট ব্যাপারের সমস্ত নথিপত্রগুলি

আমি ব্যক্তিগত ভাবে পবীক্ষা করিতাম, এবং প্রত্যেক বিষয়কে কঠোরভাবে পবীক্ষা করিতাম। এই প্রসঙ্গে আমি এইমাত্র বলিতে চাই যে, মিঃ জিন্নার অভিযোগেব যদি একটি ভগ্নাংশ মাত্র সত্য হইত, তাহা হইলে আমি কংগ্রেসী মন্ত্রীদেরকে চব্বিশ ঘণ্টার জন্যও গদীতে বসিয়া থাকা সহ্য করিতাম না। যদি মিঃ জিন্না ও তাঁহার সহকর্ম্মিগণ মনে কবেন যে, তাঁহারা মুসলমান সমাজেব কল্যাণেব জন্য এই সব কথা বলিতেছেন, তাহা হইলে আমি তাঁহাদিগকে সমস্ত অন্তর দিয়া বলিব যে, তাঁহাবা ঠিক বিপরীত কাজ কবিতেছেন। যদি তাঁহারা এই মনোভাব পবিত্যাগ না কবেন, তবে তাঁহাবা মুসলমানের সত্যিকাবের কোন উপকাব কবিতে পারিবেন না। সত্যিকারের সমাজ সেবাব আজ মুসলমানেব সব চেয়ে বেশী অভাব হইয়াছে।"

ইহাব উপব টীকাটিপ্পনী নিষ্প্রয়োজন। ইসলামের সেবা কবিতে মওলানা আজাদ কখনও কাতর হন নাই। ত্রিপলি যুদ্ধেব সময়, বলকান যুদ্ধেব সময়, এবং খিলাফত আন্দোলনেব সময মওলানা আজাদই ভাবতীয় মুসলমানকে ইসলাম সেবাব যথার্থ আদর্শ দেখাইয়াছিলেন। আব আজ যখন প্রতিক্রিয়াশীল ও সাম্প্রদায়িক নেতাগণ মুসলমান সমাজকে বিপথে লইয়া যাইতেছেন, তখনও মওলানা আজাদ মুসলমানের প্রতিনিধিরূপে স্বাধীনতার পতাকা হস্তে দাঁড়াইয়া আছেন।

মওলানার ধর্ম্মমত

ইসলাম ধর্ম্মে মওলানা আজাদের অগাধ বিশ্বাস। ছেলেবেলা হইতে ধর্ম্ম বিষযক বহু প্রামাণ্য গ্রন্থ পাঠ কবিয়াছেন। কিন্তু অন্যান্য আলেমদের মত তিনি গোঁড়া মত পোষণ করেন না। ধর্ম্ম সম্বন্ধে ও তাহাব ব্যাখ্যায় তিনি সব সময় উদাব মত পোষণ কবেন। নানা গ্রন্থ ও নানা শাস্ত্র আলোচনা করিয়া তিনি তাঁহার মনকে সর্ব্বপ্রকাব গোঁড়ামীব বন্ধন হইতে মুক্ত কবিতে সমর্থ হইয়াছেন। প্রত্যেক বিষয়কে স্বাধীনভাবে দেখিবাব ও আলোচনা কবিবাব জন্য তাঁহাব একটি নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী আছে। সেই জন্য প্রাচীন ধর্ম্মীয় মতবাদেব ও গোঁড়া শিক্ষা পদ্ধতিব প্রভাব হইতে মুক্ত হইয়া তিনি স্বাধীন ভাবে স্বীয় সমালোচনাব কষ্টিপাথবে বিভিন্ন সমস্যাকে পরীক্ষা কবিয়া থাকেন। মওলানা আজাদকে সম্যক ভাবে বুঝিতে হইলে মুসলমান সমাজের মধ্যে যে সব ধর্ম্মীয় মতবাদ (theological school) প্রচলিত আছে, সেগুলিব কিছু কিছু বিবরণ জানা দরকাব। পবিত্র কোর-আন ও হদীসের বিভিন্ন ভাষ্য-কারগণ যুক্তিব বিভিন্ন পথ ধবিয়া চলিতেন। এই সব ভাষ্যকাবগণের কেহ ভক্তিব দিক দিয়া, কেহ যুক্তিব দিক দিযা এবং কেহ ঐতিহাসিকেব দৃষ্টি-ভঙ্গীতে ইসলাম সম্বন্ধে আলোচনা করিতেন। মওলানা আজাদ এই পথ তিনটিব আশ্রয় লইয়া থাকেন। কিন্তু তদুপবি তিনি আর একটা নূতন দৃষ্টি-ভঙ্গীতে ইসলামকে পাঠ কবিয়াছিলেন, সেইটা হইতেছে বিশ্ব পরিস্থিতির দৃষ্টিভঙ্গী। এই নূতন দৃষ্টিভঙ্গীতে খুব কম আলেমই ইসলামকে দেখিয়া-

ছিলেন। মওলানা আজাদ একটা নূতন "ইলমে কালাম" (অর্থাৎ ইসলামের যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যাব অভিনব পথ) আবিষ্কার কবিয়াছেন। তিনি কঠোর যুক্তি পূর্ণ মন লইয়া সকল বিষয়েব শিকডে প্রবেশ কবিতে ভালবাসেন। কোন বিষয়কে স্বতঃসিদ্ধ ভাবে গ্রহণ কবিতে অস্বীকাব কবেন। প্রাচীন কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে,—অথবা বড বড 'অথাবিটিব' দ্বাবা সমর্থিত হইয়াছে, এই অজুহাতে তিনি কোন বিষয়কে অতি পবিত্র ও অবশ্য প্রতিপাল্য বলিয়া স্বীকার কবেন না। যাহারা বিশ্বাস কবে শাস্ত্রে সবই লেখা আছে, শাস্ত্রেব বাহিরে আব কোন বিষয়ই নূতন হইতে পাবে না, তিনি তাহাদেব অন্তর্ভুক্ত নহেন। তাঁহাব একটা ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী আছে। শাস্ত্রেব প্রত্যেক বচনকে তাহাব পূর্ব্ববর্ত্তী বিষয়েব সহিত তুলনা করিয়া এবং শাস্ত্রোক্ত সমুদয় আদর্শেব মর্ম্ম দ্বাবা পরীক্ষা কবেন। শুধু তাহাই নহে, মূল বচনের সহিত সমগ্র গ্রন্থেব উদ্দেশ্যের কি সম্বন্ধ আছে তাহাও বিবেচনা করেন। ধর্ম্মের অন্তর্গত বিভিন্ন বিষয়ের মধ্য হইতে ধর্ম্মেব মূল শিক্ষাকে বাছিয়া লইতে চাহেন। এই সকল কাবণে তিনি ইসলামকে তথা কোর-আনকে অন্যান্য লেখক ও ভাষ্যকারের মত দেখেন না। তিনি তাঁহার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী দিয়া পৃথিবীর সকল ধর্ম্মকে আলোচনা কবেন।

তাঁহাব সূক্ষ্ম বিচাব বুদ্ধি ও উদার দৃষ্টিভঙ্গীব জ্বলন্ত প্রমাণ হইতেছে তাঁহাব বচিত সুবিখ্যাত গ্রন্থ "তাবজুমানুল কোর-আন"। ইহা একাধারে পবিত্র কোর-আনেব অনুবাদ ও ভাষ্য। তিনি যে দৃষ্টিভঙ্গী দিয়া এই গ্রন্থ লিখিয়াছেন উপক্রমণিকায় তাহার বিস্তৃত আলোচনা আছে। এই অনুবাদের একটা ইতিহাস আছে তাহা এখানে অপ্রাসাঙ্গিক হইবে না। যখন তিনি রাঁচিতে চারি বৎসর

অন্তরীণে আবদ্ধ ছিলেন, তখন এই গ্রন্থের দুই তৃতীয়াংশ শেষ কবিয়াছিলেন। তিনি ইহাব শেষ অংশ লিখিতে ব্যস্ত আছেন, এমন সময় একদিন ডেপুটি কমিশনাব হঠাৎ তাঁহাব আবাসস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি আসিয়াই তাঁহার গৃহ পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে অনুসন্ধান কবিতে লাগিলেন, এবং হাতেব কাছে পবিত্র কোর-আনেব অনুবাদের পাণ্ডুলিপিগুলি পাইয়া লইযা গেলেন, এবং তাহা ভাবত সরকাবেব নিকট পাঠাইয়া দিলেন। অন্তরীণ হইতে মুক্তি পাইবাব পব সেগুলি তাঁহাকে ফেবৎ দেওয়া হয় নাই। তিনি এজন্য বহু লেখালেখি করিলেন। কিন্তু কোন ফল হইল না। অবশেষে লর্ড সিংহেব মধ্যবর্ত্তিতায় ভাবত সবকাবকে আবেদন কবিলেন। তখন তাঁহাকে বিহাব গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন কবিতে বলা হইল। বিহাব গবর্ণমেণ্ট অবশ্য তাঁহাকে পাণ্ডুলিপিগুলি ফেবৎ দিলেন, কিন্তু সেগুলিব অধিকাংশ অগ্নিদগ্ধ হইয়া ছিঁড়িয়া ফাটিয়া গিয়াছিল, তাহাব পাঠোদ্ধার করা সম্ভব ছিল না। ইহাব কাবণ স্বরূপ বিহাব গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে জানাইলেন, যে গৃহে এই পাণ্ডুলিপি ছিল তাহাতে আগুন লাগিয়াছিল, ইহাব একটা অংশ একেবারেই পুড়িয়া গিয়াছিল। গবর্ণমেণ্ট বুঝিতে পাবেন নাই যে, এইভাবে একটি অমূল্য রত্ন হেলায় নষ্ট হইয়া গেল। মিঃ জে, এস, মিলেব ভৃত্য কাবলাইলের 'ফবাসী বিপ্লবের' প্রথম খণ্ড পুড়াইয়া দিয়া কি ক্ষতি করিয়াছিল তাহা যেমন সে জানিতে পাবে নাই, দায়িত্বশীল বিহাব গবর্ণমেণ্টও মওলানা আজাদেব উক্ত গ্রন্থের মর্য্যাদা বুঝিতে পারেন নাই। অসীম ধৈর্য্যশীল কারলাইল যেমন পুনবায় প্রথম খণ্ড লিখিয়া ফেলিলেন, মওলানা আজাদও আবাব বহু কষ্ট সহকারে সমস্ত গ্রন্থই নূতন কবিয়া লিখিয়া ফেলিলেন। মওলানা আজাদের

এই গ্রন্থ ইসলামী-সাহিত্যে এক অপূর্ব্ব দান। যাঁহারা রাজনীতি বিষয়ে তাঁহার সহিত একমত নহেন, তাঁহারাও এই গ্রন্থকে উচ্চ স্থান দিয়া থাকেন। কারণ মওলানা আজাদের গভীর জ্ঞান, সমালোচনার দৃষ্টিভঙ্গী শুধু ভারতে নয়, ভারতের বাহিরেও বিশ্ব-মুসলিমের নিকট সুপরিচিত ও সমাদৃত।

মওলানা আজাদ একটা মৌলিক প্রস্তাবনা লইয়া তাঁহার এই গ্রন্থ আরম্ভ করিয়াছেন। সে প্রস্তাবনা হইতেছে "ধর্ম্মের শিকড়।" সমস্ত ধর্ম্মের শিকড় এক। প্রত্যেক দেশ, জাতি ও যুগের জন্য এক এক জন পয়গম্বর বা প্রেরিত মহাপুরুষ ও শিক্ষক আসিয়াছেন। তাঁহারা যে মূল নীতি শিক্ষা দিয়াছিলেন, তাহা সর্ব্বদাই একই বিষয়কে লইয়া। মওলানা আজাদ কোর-আনের একটা শ্লোক উল্লেখ করিয়া দেখাইতেছেন যে, যে দেশেই হউক না কেন, যে যুগেই হউক না কেন, খোদার দ্বারা প্রেরিত পয়গম্বরগণ মানব জাতির জন্য একই সর্ব্বজনীন উপদেশ দিয়াছেন, যথা:—বিশ্বাস ও সৎকর্ম্ম; অর্থাৎ ঈশ্বরের পূজা ও সৎব্যবহার। যে কোন শিক্ষা যাহা এই আদর্শের বিপরীত তাহা ধর্ম্ম নহে। কোর-আন বলিতেছে:—"জগতের প্রত্যেক জাতির জন্য আমি একজন পয়গম্বর পাঠাইয়াছি—তিনি তাহাদিগকে আল্লাহকে পূজা করিতে, এবং রিপুর দ্বারা বিভ্রান্ত না হইতে শিক্ষা দিয়াছেন।" (৬—১৮) কোর-আন আরও বলিতেছে:—"তোমার পূর্ব্বে আমি এই আদেশ ব্যতীত অন্য কোন আদেশ দিয়া পয়গম্বর পাঠাই নাই যে, আমি এক আল্লাহ, আমি ব্যতীত আর কাহারও পূজা করিতে হইবে না।" কোর-আন আরও বলিতেছে যে, "খোদা সকল মানুষকে মানুষ ভাবেই সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহারাই বিভিন্ন নাম ও ছাপ লইয়াছে এবং মানুষের একতাকে

টুকরা করিয়া কাটিয়া দিয়াছে।" তোমরা যেমন বিভিন্ন বস্তু হইতে জন্মগ্রহণ কব, তেমনি তোমবা বিভিন্ন নাম গ্রহণ কব এবং একে অপর হইতে পৃথক হইয়া পড। তোমরা বিভিন্ন দেশে জন্মগ্রহণ কর, সেইজন্য তোমাদেব এক দেশেব লোক অন্য দেশেব লোকেব সহিত যুদ্ধ কবে। তোমরা বিভিন্ন জাতিব (Race) অন্তর্ভুক্ত, সেই জন্য তোমরা পরস্পর মারামাবি কর। তোমবা বিভিন্ন বর্ণ লইয়া জন্মগ্রহণ কব, তাই তোমাদের পরস্পবেব ঘৃণা হইতে বর্ণযুদ্ধ হইয়া থাকে। এই ধবণেব আবও অগন্য বিভাগ আছে যথা, ধনী নির্ধন, প্রভু ভৃত্য, উচ্চ বংশ, নিম্ন বংশ, সবল দুর্ব্বল, ইত্যাদি। এই সব বিভাগ ঝগডা ও অনৈক্য সৃষ্টি কবিতে বাধ্য। তাহা হইলে কোন্ 'রেশমী সূতা' এই সমস্ত বিক্ষিপ্ত টুকরাকে একত্র করিয়া একটি মালা গাঁথিয়া দিতে পাবে, এবং বিভক্ত মানবমণ্ডলীকে এক অবিভিক্ত ভ্রাতৃত্ববন্ধনে আবদ্ধ কবিতে পারে? সেই 'বেশমী সূতা'—সেই পবিত্র বন্ধন হইতেছে—এক আল্লাহ্ ব পূজা। তোমরা পবস্পব হইতে যতই বিভক্ত হও না কেন, তোমাদেব পৃথক আল্লাহ থাকিতে পাবে না। তোমরা সকলেই এক আল্লাহ্ ব ভৃত্য। এবং তোমাদের প্রার্থনা ও উপাসনা সেই পবিত্র আল্লাহ্ র জন্যই। তোমাব দেশ কি, জাতি কি, উপজাতি কি, তাহা দেখিবার দরকাব নাই। যে মুহূর্ত্তে তুমি সেই এক পিতার পদে আত্মসমর্পণ করিবে, সেই মুহূর্ত্তেই তিনি তোমাদের সমস্ত পার্থিব ঝগডা-বিবাদ শেষ করিয়া দিবেন। এবং তোমাদেব হৃদয়কে একত্র করিবেন। তখন তুমি বুঝিবে যে, সমস্ত বিশ্ব তোমাব দেশ এবং সমগ্র মানবজাতি একই পবিবারভুক্ত, আর তোমবা সকলে একই পিতার সন্তান। পবিত্র কোর-আন এই

কথাই জোরের সহিত ঘোষণা কবিতেছে য়ে, প্রেবিত ধর্ম্ম ও মহাপুরুষ বা পয়গম্ববগণ ইহা হইতে পৃথক কোন বিশেষ শিক্ষা দেন নাই। আব ইহা হইতে বিভিন্ন কোন সত্যও জগতে নাই। তাই কোব-আন বলিতেছে:—"তোমবা যদি আমার শিক্ষাব সত্যতা অস্বীকাব কব, তাহা হইলে যে কোন গ্রন্থ হইতে ইহাব বিপবীত কথা বাহির কব, এবং এই সত্য ও জ্ঞানের বিরোধী শিক্ষা বাহিব কর যাহা তোগবা পূর্ব্বে প্রাপ্ত হইয়াছ।" (৪৬—৩) তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, কোব-আন ঘোষণা করিতেছে যে, সর্ব্ব ধর্ম্মেব চিরন্তন সত্য এক ধর্ম্ম অপব ধর্ম্মকে সমর্থন করিতেছে। তাহাই যদি হয়, তবে ইহাই প্রমাণিত হইল যে, প্রত্যেক ধর্ম্মের পশ্চাতে একটা চিব শাশ্বত সত্য বিদ্যমান আছে।

মওলানা আজাদ অতঃপব ধর্ম্মেব শাঁস বা সাব সত্য কি সেই সম্বন্ধে দৃঢ় ভাবে ঘোষণা কবিতেছেন যে, ধর্ম্মেব একটা আছে শিকড, আব কতকগুলি আছে শাখা-প্রশাখা। কোব-আন বলিতেছে যে, সমস্ত ধর্ম্ম ও শিক্ষাব দুইটি অংশ আছে, একটাব দ্বাবা ধর্ম্মেব চিরন্তন নীতি প্রকাশ পায়, এবং অপবটা ধর্ম্মের বাহিবের আকার। প্রথমটা হইতেছে মৌলিক বিষয়, অপরটা হইতেছে অপ্রধান বিষয়। কোব-আন প্রথম অংশকে বলিতেছে faith বা বিশ্বাস। আব দ্বিতীয় অংশকে বলিতেছে আচবণেব নিয়ম-পদ্ধতি। এই দুই বস্তুকে 'শারা', 'মশ্‌ক' বা 'মিনহাজ' বলা হয়। এই শব্দত্রয়ের প্রথম দুইটির অর্থ হইতেছে 'পথ' ও তৃতীয়টাব অর্থ হইতেছে পূজাব বিশেষ নিয়ম-কানুন। কোর-আন ঘোষণা কবিতেছে যে, জগতের বিভিন্ন ধর্ম্ম মৌলিক বিষয়ে পৃথক নহে; চিবন্তন সত্যের মত তাহাও চিরন্তন। কিন্তু আচরণেব নিয়মে ও

পূজাব পদ্ধতিতে পার্থক্য আছে"। ধর্ম্মসমূহ শিকড়ে পৃথক নহে, কিন্তু পত্রে শাখা-প্রশাখায় তাহাবা পৃথক। মূলেব দিক দিয়া কোন ধর্ম্ম পৃথক নহে—কিন্তু বাহ্যিক আকাবে, বা দেহে তাহাবা পৃথক। আর বাহ্যিক দিকে এই যে পার্থক্য, ইহা অবশ্যম্ভাবী। ধর্ম্মের প্রধান উদ্দেশ্য হইতেছে—মানবজাতিব কল্যাণ সাধনা। কিন্তু দেশ ও যুগ অনুসারে মানুষেব অবস্থা বিপর্য্যয় হয়, তাহাদেব মধ্যে নানা পার্থক্য ঘটিয়া থাকে। এবং প্রত্যেক দেশে বা যুগে একটা বিশেষ ধবণেব জীবন যাত্রার পদ্ধতিব প্রয়োজন হয়। বিভিন্ন দেশেব ও যুগেব জন্য বিভিন্ন প্রকাব পদ্ধতিব দরকাব হয়। সেই জন্য প্রত্যেক ধর্ম্মেব বাহ্যিক আকাবে দেশ ও যুগেব প্রভাব প্রতিফলিত হয়; সেই জন্য দেশ ও যুগেব উপযোগী কবিয়া বাহ্যিক আকাব সুগঠিত হয়। কোর-আন বলিতেছে: "হে পয়গম্বব! আমি প্রত্যেক মানব সংঘেব জন্য একটা বিশেষ ধবণেব পূজা পদ্ধতি নির্দ্ধাবিত কবিয়াছি, যাহা তাহাবা পালন করে। সুতরাং এই সব বাহ্যিক আকাব লইযা মানুষেব মধ্যে ঝগড়া করা উচিত নহে।" (২২—৬৭)। কোব-আন এইখানে ক্ষান্ত হয় নাই, আবও এক ধাপ অগ্রসব হইয়াছে এবং যাহা সকল ধর্ম্মেব সাব সত্য সেই আদর্শ শিক্ষা দিয়াছে। মানুষ কেমন কবিয়া তাহাব কল্যাণ পাইতে পাবে, এই প্রশ্নেব উত্তরে কোর-আন বলিতেছে: "মানুষ কোন দিকে মুখ বাখিয়া পূজা করে তাহাতে ধর্ম্ম নাই, ইহা পূর্ব্ব কি পশ্চিম এই প্রশ্নেব মধ্যেও ধর্ম্ম নাই। বরং সার সত্য এক আল্লাহেব পূজাতে এবং সঙ্গত আচবণে নিহিত আছে।" কোব-আনের মূল শ্লোকের অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল:—

"তুমি পূর্ব্ব দিকে অথবা পশ্চিম দিকে মুখ ফিবাও,—ইহা ধর্ম্ম নহে।

কিন্তু ইহাই ধর্ম্ম, যথা—আল্লাহকে বিশ্বাস করা, শেষ বিচারের দিনে, ফেরেশতাতে এবং প্রেরিত পুস্তকে ও পয়গম্বরে বিশ্বাস করা। ধর্ম্ম নিহিত আছে—তাঁহার প্রেমের জন্য তোমার সম্পত্তি ব্যয় করাতে, তোমার আত্মীয় স্বজনের জন্য, পিতৃহীনের জন্য, অভাবীর জন্য, পথচারীর জন্য, যাহারা চাহে তাহাদের জন্য, দাসদের মুক্তি-মূল্যের জন্য, প্রার্থনায় দৃঢ় থাকিয়া নিয়মিত দয়া করাতে, সেই চুক্তি পূর্ণ করাতে যাহাতে তুমি আবদ্ধ হইয়াছ,—বেদনায়, দুঃখে বিপদে এবং দুঃখের সকল সময় দৃঢ় হওয়ায় ও ধৈর্য্যশীল হওয়ায়—এই সবেই ধর্ম্ম নিহিত আছে। এই সব লোক সত্যের পথে ও ঈশ্বর-ভীরু।" (২—১৭৭)

এই শ্লোকের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া মওলানা আজাদ বলিতেছেন :— "নিম্নের মহা শ্লোকটির প্রতি লক্ষ্য কর : প্রত্যেক ধর্ম্মাবলম্বীদের জন্য আমি একটা বিশেষ আইন ও পথের ব্যবস্থা দিয়াছি। খোদা যদি চাহিতেন, তবে তিনি তোমাদেরকে একই ধরণের করিতে পারিতেন। (অর্থাৎ তাহা হইলে বাহ্যিক ক্রিয়া-কাণ্ডের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকিত না।) কিন্তু তিনি তোমাদিগকে পৃথক করিয়াছেন এই জন্য যে, তোমরা তাঁহার আদেশ পালন কর কিনা তাহা তিনি পরীক্ষা করিতে চাহেন। সুতরাং (এই সব পার্থক্যের উপর বেশী জোর না দিয়া) সংগ্রাম কর, সৎ আচরণের জন্য। (৫—৪৮) যখন কোর-আন অবতীর্ণ হয়, তখন বিভিন্ন ধর্ম্মের অনুবর্ত্তিগণ ধর্ম্মের বাহ্যিক আকারের উপর অধিক জোর দিত। তাহারা ভ্রম বশতঃ এই বাহ্যিক আকারকেই ধর্ম্মের মূল বস্তু বলিয়া মনে করিত। প্রত্যেকেই মনে করিত—তাহার নিজের ধর্ম্মের অনুসরণকারী ব্যতীত অন্য কোন পথে মুক্তি নাই।

কারণ তাহাদের আচার ও ক্রিয়া-কাণ্ড তাহার মত নহে। এই মনোভাবের বিরুদ্ধে কোর-আন ঘোষণা করিল যে, ইহা ধর্ম্মকে অস্বীকার করার নামান্তর মাত্র। ধর্ম্মের সার হইতেছে—এক আল্লাহের পূজা করা ও ন্যায় সঙ্গত আচরণ করা। ধর্ম্ম কোন একটা বিশেষ সমাজ ও সম্প্রদায়ের একচেটিয়া পৈতৃক সম্পত্তি নহে। আচার ও ক্রিয়া কাণ্ড সব সময়ই পৃথক হইবে, দেশ ও যুগের প্রয়োজন অনুসারে সেগুলি পৃথক হইতে থাকিবে। কোর-আনের শ্লোক আরও অগ্রসর হইয়া বলিতেছে যে, খোদা তাঁহার সর্ব্ব জ্ঞানের জন্য ইচ্ছা করিয়াই এই বিভিন্নতা সৃষ্টি করিয়াছেন। ঐ শ্লোক আরও ঘোষণা করিতেছে যে, বিভিন্ন বিধি ও পথ দেওয়া হইয়াছিল বিভিন্ন লোকের জন্য। কোর-আনের শ্লোক ইহা বলে না যে, বিভিন্ন মানুষের জন্য বিভিন্ন ধর্ম্ম দেওয়া হইয়াছিল। ইহাতে বিভিন্ন পথের কথাই বলা হইতেছে। কারণ সকলের জন্যই ধর্ম্ম এক ও অভিন্ন। বিভিন্ন বা একের অধিক ধর্ম্ম হইতে পারে না। তাই কোর-আন ঘোষণা করিতেছে যে, মানুষের প্রকৃতি এরূপভাবে গঠিত যে, এই সব বাহ্যিক পার্থক্য নিশ্চয় ঘটিবে, এবং প্রত্যেকে মনে করে যে, তাহার পন্থা অপর হইতে শ্রেষ্ঠতর। মানুষ তাহার প্রতিপক্ষের দৃষ্টিভঙ্গী দিয়া নিজের বস্তুকে দেখিতে পারে না। কিন্তু তোমার দৃষ্টিতে যেমন তোমার পথ শ্রেষ্ঠ, সেইরূপ অন্য লোকের দৃষ্টিতে তাহার পথ শ্রেষ্ঠ। তাহা হইলে উদারতাই একমাত্র পথ।"

কোর-আনের আরও তিনটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া মওলানা আজাদ দেখাইতে চান যে, কোর-আন যাহা শিক্ষা দিতে চায় এগুলি তাহার

সার মর্ম্ম, যথা একবিংশ সুরার—৯২, ৯৩, এবং ৯৪ শ্লোক। এই তিনটি শ্লোকে আছে :—

৯২—এই সব পয়গম্বরকে যে শিক্ষা দিযাছি তাহা এই যে—তোমরা সকলেই একই ভ্রাতৃত্বের অন্তর্গত (কোন পৃথক ধর্ম্ম নাই, কোন পৃথক দল নাই)। এবং আমিই তোমাদের সকলের এক মাত্র (পোষণকারী) প্রভু। সুতরাং আমাকেই পূজা কর (এবং এই বিষয়ে পৃথক হইও না)।

৯৩—কিন্তু মানুষ নিজেদের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করিয়াছে, তাহাদের এক ধর্ম্মকে টুকরা টুকরা করিয়া কাটিয়াছে, শেষে সকলকে আমাদের দিকেই ফিরিয়া আসিতে হইবে।

৯৪—সুতরাং (এই সত্য স্মরণ রাখিও) যে কেহ সৎ কাজ করে, এবং ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখে, তাহার চেষ্টা ব্যর্থ হইবে না। আমরা তাহার সৎ কাজ সমূহ নথীভুক্ত করিতে রহিয়াছি।

এই সব শ্লোক হইতে মওলানা আজাদ সিদ্ধান্ত করিয়া বলিতেছেন :—"বিভিন্ন যুগে ও বিভিন্ন জনসমাজের মধ্যে যে সমস্ত পয়গম্বর আসিয়াছেন, তাঁহাদের সমস্ত শিক্ষার সারাৎসার তবে কি? বিভিন্ন যুগের ও বিভিন্ন দলের মানব মণ্ডলীর জন্য তাঁহাদের কি বাণী ছিল? তাহা কি এক ছিল, অথবা বহু ছিল? ৯২ শ্লোক বলিতেছে যে, তাঁহাদের বাণী একটি মাত্রই ছিল এবং তাহা এই :—তোমরা সকলে মানব জাতির একটি মাত্র ভ্রাতৃ-সংঘ। তোমাদের পালন কর্ত্তা ও রক্ষা কর্ত্তা এক জনই। সুতরাং তোমরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইও না,—কেবল তাঁহাকেই পূজা কর। কিন্তু মানুষ এই শিক্ষা

ভুলিয়া গিয়াছে এবং ধর্ম্মকে বহু শাখায় বিভক্ত করিয়াছে এবং একটি ধর্ম্ম হইতে নানা ধর্ম্ম বচনা কবিল এবং এক দল অপর দল হইতে কাটিয়া গিয়া সবিয়া আসিল। একত্বেব পবিবর্ত্তে বহুত্ব, মিলনের পবিবর্ত্তে বিচ্ছেদ হইয়া পড়িল তাহাদের সমব ধ্বনি। কিন্তু শেষে প্রত্যেককে তাঁহারই দিকে ফিবিয়া যাইতে হইবে। সেখানে প্রত্যেক বস্তুই দেখান হইবে, এবং প্রত্যেক দল দেখিবে—সৎ কাজ কবিতে ভুলিয়া যাওয়াতে তাহারা কোথায় গিয়া পঁহুছিয়াছে।

"সমস্ত গৌরব ঈশ্বরেব। কোর-আন তাহার অপূর্ব্ব ভাষাব যাদুতে একটি সংক্ষিপ্ত শ্লোকেব দ্বাবা বহু ভাব প্রকাশ কবিয়াছে। ইহা কেবল একটা বিবৃতি নহে। ইহা এমন ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে যে, ইহা যুক্তিব একটি অবিভক্ত বন্ধন হইয়া বহিয়াছে। খোদা বলিতেছেন: (ক) তোমরা যতই বিভাগ সৃষ্টি কব না কেন, তাহাতে কিছু যায় আসে না, তোমাদের ভ্রাতৃত্ব নিশ্চয় এক। (খ) আমিই তোমাদেব একমাত্র বক্ষা কর্ত্তা, এবং আর কেহই নহে। (গ) সমগ্র মানব জাতি একদলভুক্ত এবং অদ্বিতীয় ভাবে তাহাদের বক্ষা কর্ত্তা এক। তাহা হইলে পূজাব ও 'সেজদার' ধাবা এক হইবে না কেন? কেন তাহা দুইটি হইবে? সুতবাং কেবল তাঁহাকেই পূজা কর। কারণ তোমরা এক এবং সেই একেরই জন্য। সর্ব্বত্র এই একেব কথা উল্লিখিত হইয়াছে। কোথাও বহুর কথা নাই। কোর-আনের উল্লিখিত "সেই জন্য" এই কথাটি সমস্ত যুক্তিকে আঁকড়াইয়া আছে।

"তিনটি একত্বের (unity) কথা কোব-আনেব উক্ত শ্লোকগুলিতে

সংক্ষেপে বর্ণিত আছে :—বিশ্বমানব ভ্রাতৃত্বের একতা, ঈশ্বরের একতা, এবং ধর্ম্ম ও ঈশ্বর পূজার একতা, আর এই তিনটি একত্বই হইতেছে কোর-আনের বাণীর মূল নীতি। এই মহাবাণী কোর-আন সর্ব্বত্র ঘোষণা করিতেছে। কোর-আনের সমস্ত শিক্ষা ও সাধনার ভিত্তি এই তিনটি একত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। ভ্রাতৃত্বের একত্বের অর্থ এই যে, মানব জাতির বহু বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্যের মধ্যে ইহার অন্তর্নিহিত একত্ব লুক্কায়িত আছে। ইহা ভুলিষা যাইও না যে, তোমার জাতি, বর্ণ, ভাষা, দেশ প্রভৃতি যতই পৃথক হউক না কেন, তোমরা সকলে মানব জাতির একই পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। এবং বাস্তবিকই তোমরা একই ভ্রাতৃত্বের অন্তর্গত। ঈশ্বরের একত্ব অর্থে এই বুঝায় যে, তোমরা ঈশ্বরের যত বিভিন্ন নাম সৃষ্টি কর না কেন, তোমার জন্য যত বিভিন্ন স্থান সৃষ্টি কর না কেন, তোমরা ঈশ্বরের স্বরূপ সম্বন্ধে যত বিভিন্ন ধারণা কর না কেন, তাহাতে কিছুই আসে যায় না। বিভিন্ন সম্প্রদায় নিজেদের পৃথক ধারণার জন্য যে মতভেদ সৃষ্টি করিয়াছে, তাহা প্রকৃত সত্বাকে রূপান্তরিত বা পৃথক করিতে পারে না। তোমরা যেমন একই ভ্রাতৃসংঘের অন্তর্ভুক্ত, সেই প্রকার তোমাদের রক্ষকও এক, তিনি বহু নহেন। পূজার একত্বের মানে এই যে, যদি একই ভ্রাতৃসংঘ থাকে, তাহা হইলে একটি ধর্ম্ম থাকিবে, একের অধিক ধর্ম্ম থাকিবে না। সুতরাং সৎ আচরণ হইতেছে এক আল্লাহ্‌র পূজা করা। এবং এই এক আল্লাহর পূজা করার ব্যাপারে কেহ যেন বিভক্ত ও পৃথক না হয়।”

উপরোক্ত ৯৪ শ্লোকে মুক্তি ও ধর্ম্মের মূল সূত্রগুলি পরিষ্কার ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। সেগুলি এই যে, মানবজাতি বিভিন্ন দলে বিভক্ত হওয়া সত্বেও সৎ

আচবণের (Righteousness) মূল বিষয়গুলি এক ও অভিন্ন। কোব-আন বলিতেছে যে, সেগুলি সকল যুগে একই ধবণের ছিল, যথা—খোদাতে বিশ্বাস ও সৎকর্ম্ম। যে কোন মানুষ সৎকর্ম্ম কবে তাহাব সাধনা, এবং যে মানুষ ঈশ-প্রেমে পরিপূর্ণ—তাহার সাধনা কখনও ব্যর্থ হইবে না,—তাহা নিশ্চয় খোদাব নিকট গৃহীত হইবে। এখানে "যে কোন" এই কথাটি তাৎপর্য্যপূর্ণ। য়িহুদীগণ বলে—আগে য়িহুদী হও, খৃষ্টানগণ বলে—আগে খৃষ্টান হও, তবে মুক্তি পাইবে। কিন্তু কোব-আন বলিতেছে যে, "যে কেহ সৎকর্ম্ম কবিবে এবং খোদাতে বিশ্বাস স্থাপন কবিবে—কে সেই ব্যক্তি তাহাতে কিছু আসে যায় না, যদি তাহাব খোদা-প্রীতি থাকে, এবং যদি সে সৎকর্ম্ম করে, তবে তাহাব বিশ্বাস ও কর্ম্ম কখনও ব্যর্থ হইবে না। সে নিশ্চয় পুবস্কাব পাইবে। ইহাই বিধি। তাহাব বিশ্বাস ও কাজ আমাদেব দপ্তবে থাকিবে। কে আমাদেব দপ্তব হইতে তাহা মুছিয়া ফেলিতে পাবে? জগতেব প্রত্যেককে মনে কবিতে দাও যে, তাহাব এই সৎকর্ম্ম ও বিশ্বাস ব্যর্থ হইয়াছে, কিন্তু তাহা আমাদেব দপ্তবে অবিনশ্বব অক্ষবে লিখিত থাকিবে।" কি সুমহান আদর্শ। তুমি যদি কোব-আনেব বিভিন্ন লেখকেব ভাষ্যেব প্রতি সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করে, তবে দেখিবে, কি অপ্রাসঙ্গিক তর্ক-বিতর্ক দ্বারা ইহাব সুন্দব অর্থ নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

যেখানে বিভিন্ন পয়গম্ববদেব মধ্যে পার্থক্য কবিতে নিষেধ কবা হইয়াছে, সেখানে ব্যাখ্যা করিতে গিয়া মওলানা আজাদ কোর-আনেব উক্তি উদ্ধৃত কবিয়া বলিতেছেন:—"কোব-আন বলিতেছে—যাহারা ঈশ্ববেব পথে চলিতে চায়, তাহাদের প্রত্যেকের জন্য কর্ত্তব্য যে, বিভিন্ন পয়গম্ববেব মধ্যে ও বিভিন্ন

শাস্ত্রেব মধ্যে যেন কোন পার্থক্য না করে। তাহাদেবকে সমভাবে বিশ্বাস করিতে ও কাহাকেও অস্বীকাব না করিতেই কোব-আন নির্দ্দেশ দিতেছে। সর্ব্বক্ষেত্রে এই প্রকাব মনোভাব বাখা কর্ত্তব্য। যাহা সত্য—তাহা চিব কালই সত্য—তাহা যখনই আসিয়াছে ও যাঁহাবই নিকট আসিয়াছে তাহাতে কিছু যায় আসে না—এবং আমি তাহা সর্ব্বদাই বিশ্বাস কবি। ইহাই হইল কোর-আনেব শিক্ষা।"

মওলানা আজাদেব ব্যাখ্যাত কোব-আনেব আব একটা শ্লোকেব কথা বলিয়া এই প্রসঙ্গ শেষ কবিব ; যাঁহাবা ধর্ম্মবিশ্বাসকে আচবণ হইতে পৃথক কবিয়া দেখেন, মওলানা আজাদ তাঁহাদেব অন্তর্গত নহেন। এই বিষয়টি তিনি তাঁহাব কোর-আনেব ভাষ্যে সুন্দব ভাবে ব্যাখ্যা কবিয়াছেন। তিনি বলেন:— "য়িহুদীগণ বিশ্বাস কবে যে, তাহাবাই ঈশ্ববেব একমাত্র নির্ব্বাচিত জাতি, আব ঈশ্বব তাহাদিগকে যে ধর্ম্মীয় সত্য দিযাছেন তাহা তাহাদেব একচেটিয়া সম্পত্তি। কিন্তু কোব-আন তাহা অস্বীকাব কবিতেছে। য়িহুদীদেব ধর্ম্মান্ধতাব সীমা ছিল না। তাহাবা বলিত যে, যেহেতু তাহাবা য়িহুদী, সেই হেতু তাহাবা নবকের অগ্নি হইতে অব্যাহতি প্রাপ্ত হইয়াছে। আব যদিও খোদা তাহাদিগকে নবকেব আগুনে প্রেবণ কবেন, তবে তাহা তিনি ক্রোধবশতঃ কবিবেন না। তিনি এই জন্য তাহাদিগকে নবকে প্রেরণ কবিবেন যে, তাহাবা যেন নরকের আগুন দ্বারা বিদগ্ধ হইয়া আরও পরিষ্কার ও নির্ম্মল হইয়া স্বর্গে যাইতে পাবিবে। কোব-আন এই অসাব দম্ভ চূর্ণ কবিয়া দিয়াছে, এবং জিজ্ঞাসা করিতেছে: তোমরা কোথা হইতে এই ধারণা পাইলে যে, প্রত্যেক য়িহুদীকে আশ্বাস দেওয়া হইয়াছে যে, সে মুক্তি

পাইবে এবং নবকেব আগুন হইতে অব্যাহতি পাইবে? ঈশ্বব কি তাহাদিগকে মুক্তির সনদ দিয়া ফেলিয়াছেন? যখন তোমাদের এ বিষয়ে কোন প্রমাণ নাই, তখন কি তোমরা ঈশ্বরকে অস্বীকার করিতেছ না? এবং তাঁহাকে মিথ্যাবাদী বলিতেছ না?" কোর-আনেব শ্লোকটি এইরূপ:—("হে মুসলমানগণ, স্মরণ কব), তোমাদেব আকাঙ্ক্ষার উপব মুক্তি নির্ভব কবে না, অথবা যাহাদেব উপর পবিত্র গ্রন্থ আসিয়াছে তাহাদেব ইচ্ছাব উপর মুক্তি নির্ভর কবে না। ঈশ্ববেব বিধি এই যে, যে কেহ মন্দ কাজ কবিবে তাহাকেই তাহার ফল ভোগ করিতে হইবে, তখন ঈশ্বরের ক্রোধ হইতে আপনাকে বাঁচাইতে সে কোন সাহায্যকাবী অথবা বন্ধু পাইবে না।" "আর্সেনিক" বা সেঁকো বিষ খাইলেই মবিতে হইবে, ইহাতে য়িহুদী, অথবা অন্য কোন জাতিব মধ্যে কোন ভেদ নাই, অথবা যে দুধ খাইবে সে পুষ্ট হইবে, ইহাতেও কোন জাতি-বিচাব নাই। সেইরূপ আধ্যাত্মিক জগতে প্রত্যেক মানুষ তাহাই পাইবে যাহা সে রোপণ করিবে—তাহার ধর্ম্মবিশ্বাস যাহাই হউক না কেন, তাহাতে কিছু যায় আসে না।"

মওলানা আজাদ কি কখনও এক ধর্ম্মের উপব অন্য ধর্ম্মেব প্রভুত্ব স্থাপনে বিশ্বাস করেন? ১৯২২ সালে আদালতে বিচারকালে তিনি জবানবন্দী স্বরূপ যে বিবৃতি দেন, তাহাতে Sovereignty of Islam (ইসলামেব প্রভুত্ব) কথাটা ব্যবহার করিয়াছিলেন। ইহা বলিতে তিনি কি বুঝিয়াছিলেন? ইসলামের তিনি যে উদাব ব্যাখ্যা কবিয়াছেন তাহাতে মনে হয় না যে, তিনি জগতের বুকে মুসলিম প্রভুত্ব স্থাপন কবিতে প্রয়াসী। তাঁহার বিবাট তফসীর বা ভাষ্য "তারজুমানুল কোর-আন" এই মতবাদের প্রতিবাদ করিতেছে।

তাঁহার এই তফসীর হইতেই ইহার উত্তর পাওয়া যাইবে। তাঁহার দৃষ্টিতে "ইসলাম" শব্দের অর্থ হইতেছে "সত্যকে স্বীকার করা ও সেই অনুসারে কাজ করা"। কোর-আন বলিতেছে যে, ধর্ম্মের সার সর্ব্বত্র একই প্রকার, যথা :—ঈশ্বর কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত পথ অনুসরণ করিয়া চলা। সত্যের এই পথ কেবল মানবের জন্য নহে, বরং সমগ্র সৃষ্ট জীবের জন্য। সুতরাং "ইসলামের প্রভুত্ব— ইহার অর্থ এই যে, তাহাদেরই প্রভুত্ব যাহারা চিন্তায়, কথায় ও কাজে ঈশ্বরে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করিয়াছে। এই আদর্শ অপেক্ষা কম নহে, বেশীও নহে, অর্থাৎ যাহারা ঈশ্বরের প্রভুত্বে ও সৎ আচরণে বিশ্বাস করে, তাহাদেরই প্রভুত্বে মওলানা আজাদ বিশ্বাস করেন। তাই মওলানা আজাদ পুনঃ পুনঃ ঘোষণা করিতেছেন যে :—ইসলাম নূতন ধর্ম্ম নহে,— যাহারা ঈশ্বরের পথ হইতে সরিয়া আসিয়াছে, ইসলাম তাহাদিগকে সেই পথে লইয়া যাইবার জন্য আহ্বান ব্যতীত আর কিছুই নহে। কোর-আনের সাধারণ ভাষ্যের সহিত মওলানা আজাদের ভাষ্যের পার্থক্য এইখানে রহিয়াছে। মওলানা আজাদের মত এমন উদার ভাবে আর কেহ কোর-আনের ব্যাখ্যা দিতে পারেন নাই। ইসলামকে বুঝিতে হইলে আমাদের এই গ্রন্থ পড়া একান্ত দরকার। ইসলামিক সাহিত্য ও সংস্কৃতির ইতিহাসে ইহা এক অপূর্ব্ব গ্রন্থ। মুসলমান সমাজে ইহার যতই আদর হইবে, ততই সমাজের অন্ধ মানসিকতা দূর হইয়া যাইবে। ইসলামে জ্ঞানলাভেচ্ছু প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য- ইহা একজন ভারতীয় মুসলমানের অমূল্য উপহার।

মওলানা আজাদের ব্যক্তিত্ব ও বৈশিষ্ট্য

মওলানা আজাদের ব্যক্তিত্ব ও বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে দু'একটা কথা বলিয়া এই গ্রন্থেব উপসংহাব করিব। দীর্ঘ ঋজু ও গৌববর্ণ—এই মানুষটির চেহাবার মধ্যে এমন একটা বাজোচিত ভাব আছে, যাহা একই সঙ্গে তাঁহাব বুদ্ধি, প্রতিভা ও তেজস্বিতাব পবিচয় দেয়। মওলানা আজাদ ইস্‌লামেব শ্রেষ্ঠ সংস্কৃতির পূর্ণ প্রতীকস্বরূপ। তাঁহাব আচবণে ও কথাবার্ত্তায় এমন একটা মৃদুতা ও মার্জ্জিত রুচির ভাব বিদ্যমান আছে যে, তিনি যেখানেই গমন কবেন, সেইখানেই ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রাপ্ত হন। ইহাব সহিত যুক্ত হইয়া আছে তাঁহার একটা গম্ভীব ও সংবক্ষিত ভাব। ইহারই জন্য জনসাধারণ নিত্য যে সব নেতাদের সহিত পরিচিত হয়, তাঁহাকে তাঁহাদের পর্য্যায়ে ফেলিতে পাবে না। জনপ্রিয় হইতে হইলে যে সব গুণের প্রয়োজন, তাহা তাঁহাতে অল্প আছে। সেই জন্য তিনি সর্ব্বত্র জনপ্রিয় নহেন, অথবা তাঁহাব সম্বন্ধে অধিক লোক বেশী আলোচনা করে না। তাঁহাব গভীব জ্ঞান ও জানিবাব অসীম পিপাসার সহিত যুক্ত হইয়াছে তাঁহাব স্বাধীন চিন্তা এবং উদাব ও সংস্কারমুক্ত হৃদয়। একাকী থাকিতে ভালবাসেন বলিয়া সব সময় সর্ব্ব শ্রেণীর লোকেব সহিত মেলামেশা কবেন না। দবিদ্র লোকের প্রতি সহানুভূতিব অভাবে যে তিনি সর্ব্বসাধাবণ লোকেব সহিত মেশেন না, তাহা নহে। পিতাব আশ্রয়ে একাকী থাকিবাব যে অভ্যাস তিনি শৈশব হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, পবিণত বয়সেও তাহা পরিত্যাগ কবেন নাই।

দেশের দরিদ্র লোকেব জন্য তিনি অন্যান্য নেতাদেব মতই মর্ম্মবেদনা অনুভব করেন। তিনি বলেন: "যাহাদের কিছু আছে, আব যাহাদের কিছু নাই, এই দুই দলেব মধ্যে যে ব্যবধান তাহা চিরতবে বিদূরীত না হইলে প্রকৃত স্বরাজ আসিবে না। গবীবদেব অবস্থা উন্নত কবিবার একটা সুন্দর উপায় হইতেছে খদ্দব। খদ্দবের সার্ব্বজনীন ব্যবহাব আমাদিগকে চিন্তা করিতে বাধ্য করে যে, আমবা এক যায়গায় আমাদেব লক্ষ লক্ষ পদানত জনসাধাবণের সহিত এক হইয়া গিয়াছি। আমরা যুগ যুগ ধরিয়া যে পদে অধিষ্ঠিত ছিলাম, সেখান হইতে কি আমবা নিম্নে আসিতে চাই? আমবা কি চাই না যে, আমাদেব অপেক্ষা হতভাগ্য ভ্রাতাগণ আমাদেব সহিত একই পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইতে থাকুক, আমাদের সঙ্গে কাজ কবিতে থাকুক? আমরা কি চাই না যে, আমাদেব জনসাধাবণ স্বাধীনতাব জন্য সংগ্রাম কবিয়া আমাদের মতই আনন্দ ও গৌবব অনুভব করুক?—এবং স্বাধীনতার স্বাদ উপভোগ করুক? নেতারা যদি চাহেন যে, জনসাধাবণ তাহাদের সহিতই জাগিয়া উঠিবে, তাহা হইলে সার্ব্বজনীন খদ্দব ব্যবহাব ব্যতীত অন্য পথ নাই।" মওলানা আজাদ দবিদ্র দেশবাসীর কথা খুবই ভাবেন। তবে তিনি এমন উপাদানে গঠিত যে, গান্ধীজীর মত গ্রামে গিয়া তাহাদেব পার্শ্বে উপবেশন করেন না। মওলানা আজাদ নিজ ক্ষমতা ও শক্তির সীমা খুব ভাল কবিয়াই বুঝেন। আর বুঝেন বলিয়াই সীমা লঙ্ঘন কবেন না। এইদিকে তাঁহার বেশ একটু দুর্ব্বলতা আছে। কিন্তু তাঁহাব অন্যান্য গুণের কথা চিন্তা করিয়া এই দুর্ব্বলতাটুকু কেহ বড় একটা লক্ষ্য কবেন না। তাঁহার গভীর বিদ্যা ও মানসিক ভাব তাঁহাকে সর্ব্বদাই একটা উচ্চ আসনে সমাসীন করিয়াছে।

তিনি যেন যুক্তি ও বিচার বুদ্ধির সাক্ষাৎ প্রতিমূর্তি। তিনি আলোচ্য প্রত্যেকটি বিষয়ের সপক্ষ ও বিপক্ষ দিকগুলি যুক্তির নিক্তিতে ওজন করিয়া দেখিয়া থাকেন, তবেই কোন বিষয়ে মনস্থির করেন। হঠাৎ কোন একটা বিষয় বুঝিবার তাঁহার অপার শক্তি আছে। সেই শক্তির বলে তিনি অনেক বড় বড় সমস্যা জলের মত বুঝিয়া ফেলেন এবং অপরকেও বুঝাইয়া দেন। কোন কঠিন সমস্যাকে তিনি বাগ্মীতা ও পরিচ্ছন্নতার দ্বারা এমন সহজভাবে বুঝাইতে পারেন, যাহা বহু লোকে পারে না। পণ্ডিত মতিলাল নেহরু ও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। তাঁহারা প্রায়ই মওলানা আজাদের পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। স্বরাজ্য পার্টিতে কোন বিষয় আলোচনার জন্য পণ্ডিত মতিলাল নেহরু নৈতিক ও মানসিক সমর্থনের জন্য মওলানা আজাদের উপর নির্ভর করিতেন। গান্ধীজীর কোন "পয়েন্ট" অন্যান্য নেতারা সহজে ধরিতে পারিতেন না। কিন্তু মওলানা আজাদ নিমেষ মধ্যেই তাহা ধরিতে পারিতেন এবং মহাত্মাজীকে বলিতেন, "মহাত্মাজী। আমি সঙ্গে সঙ্গে আপনার এই কথাটি ধরিতে পারিয়াছি।" তখন বৃদ্ধ পণ্ডিত মতিলাল তামাসাচ্ছলে বলিতেন যে, "দুঃখ এই যে মওলানা, আপনি প্রত্যেক বিষয়কে তাড়াতাড়ি বুঝিতে পারেন।" তখন নেতাদের মধ্যে হাসির হর্‌রা উঠিত।

মওলানা আজাদ যখন কঠোর হন এবং কোন গুরুতর বিষয়ে মনোনিবেশ করেন, তখন মূর্তি অন্যরূপ। কংগ্রেস দলের মধ্যে তাঁহার মত কূটনৈতিক ডিপ্লোম্যাট খুব কমই আছে। একবার কোন একটা বিষয় গ্রহণ করিলে তিনি তাহাকে সকল দিক হইতে ও সকল প্রকার দৃষ্টিভঙ্গী হইতে

বুঝাইবার জন্য তাঁহার জ্ঞানভাণ্ডারের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দেন। ইহাতে তাঁহার সমকক্ষ কেহই নাই। এই জন্য অনেক কঠিন বিষয় সিদ্ধান্ত করিবার পূর্ব্বে গান্ধীজী তাঁহার দিকে পুনঃ পুনঃ তাকাইয়া থাকেন। গান্ধীজী ও মওলানা আজাদের মধ্যে এক অকৃত্রিম ভালবাসা বিদ্যমান আছে। তাঁহারা পরস্পরে অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ। ১৯৩৯ সালে সিন্ধু প্রদেশের মন্ত্রীত্ব সমস্যার সমাধান করা কঠিন হইয়া উঠিল। ব্যাপারটি এমন অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিল যে, শেষে উহা গান্ধীজীর নিকট আনিত হইল। মওলানা আজাদ বলিলেন,—"আমার মন আমাকে এক দিকে লইয়া যাইতেছে, কিন্তু এই সব ব্যাপারে আমি আপনার পরামর্শ চাই।" কিন্তু তদুত্তরে গান্ধীজী বলিলেন—"না, তাহা হইবে না, আমি স্থির করিয়াছি যে, এই ব্যাপারে আপনার কথাই চরম হইবে এবং আমি বল্লভভাই প্যাটেল ও রাজেন্দ্রপ্রসাদকে আপনার কথা মানিয়া লইতে উপদেশ দিব।" তদুত্তরে মওলানা আজাদ বলিলেন: "কিন্তু আমার নিকট আপনার কথাই শেষ কথা।" এইভাবে উভয় নেতার মধ্যে অনেকক্ষণ ধরিয়া স্নেহপূর্ণ ভাষায় কথা কাটাকাটি হইল। অবশেষে মওলানা আজাদকেই সিন্ধুর ভার লইতে হইল। তিনি কিরূপ দক্ষতার সহিত সিন্ধুর সমস্যার সমাধান করিয়াছেন তাহা দেশবাসী অবগত আছেন। গান্ধীজীর প্রতি মওলানার এই যে ভালবাসা তাহার কারণ কি? ইহার উত্তরে মওলানা আজাদ বলিয়াছেন: "গান্ধীজীর তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ব্যতীত সত্যের প্রতি তাঁহার আগ্রহ আমাকে তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট করিয়াছে। ১৯২৬ সাল পর্য্যন্ত আমি বহু ক্ষেত্রে সন্দিগ্ধচিত্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম। তাহার পর "Young India"তে গান্ধীজীর একটি প্রবন্ধ পাঠ করিলাম। তাহাতে

তিনি তাঁহার স্ত্রীর একটা সামান্য পদস্খলনের জন্য তাঁহার আত্মাকে খুলিয়া দিয়াছিলেন। মিসেস গান্ধীকে কোন ব্যক্তি একটা উপহার দিয়াছিল, তাহা তিনি আশ্রমের ম্যানেজারকে দিতে ভুলিয়া গিয়াছিলেন। তাহারই জন্য তিনি "Young India"তে প্রবন্ধ লেখেন। তখন আমি বুঝিলাম, গান্ধীজী একজন মানুষ যাহার সত্যতা সম্বন্ধে তাঁহার শত্রুগণও সন্দেহ করিতে পারে না। তাঁহার সত্য-প্রীতি তাঁহাকে কতদূর লইয়া যাইতে পারে তাহা দেখিয়া আমি চমৎকৃত হইলাম।"

বহুকাল হইতে মওলানা আজাদ কংগ্রেস মহলে এক অপূর্ব্ব মর্য্যাদা ও প্রতিপত্তি পাইয়া আসিতেছেন। কংগ্রেসের সভাপতি হিসাবেই হউক, আর অন্যভাবেই হউক, সর্ব্ব অবস্থায় তিনি কংগ্রেসের একজন প্রধান উপদেষ্টারূপে আদৃত হইয়া আসিতেছেন। তাঁহার এত মর্য্যাদা আছে, কিন্তু তিনি ক্ষমতা ও মর্য্যাদা লাভের জন্য আদৌ আগ্রহান্বিত নহেন। তিনি সর্ব্বদাই দূরে থাকিতে চাহেন। প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসনের পূর্ব্বে, অথবা পরে তিনি আইন পরিষদে প্রবেশ করিয়া পার্টির নেতা বা পরিচালক হইতে পারিতেন, কিন্তু তিনি এই সব পন্থা সযত্নে পরিহার করিয়া চলেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ও পণ্ডিত মতিলাল নেহরু সর্ব্বদাই তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। কোন জটিল বিষয়ে সিদ্ধান্ত করিবার পূর্ব্বে মওলানা আজাদের উপদেশ গ্রহণ না করিয়া তাঁহারা অগ্রসর হইতেন না। মওলানা আজাদ সামনে না থাকিয়া পশ্চাতে পরামর্শদাতারূপে থাকিতেই বেশী পছন্দ করেন। সহজে কোন ব্যাপারের পুরোভাগে আসিতে চাহেন না।

লেখাপড়ার চর্চ্চা ও জ্ঞানের সাধনাই তাঁহার একমাত্র বিলাস। পুস্তক

ও গবেষণার মধ্যে ছাড়িয়া দিলে তিনি দিনের পর দিন পরম আনন্দে কাটাইয়া দিতে পারেন। মওলানা আজাদ আরবী, ফারসী ও উর্দ্দু ভাষায় সুপণ্ডিত। তিনি যখন কথা বলেন, তখন মনে হয় যেন অন্তরের গভীরতম প্রদেশ হইতে এক মহিমময়ী বাণী উচ্চারিত হইতেছে। তিনি সাধারণতঃ হিন্দুস্থানী ভাষায় কথা বলেন। তিনি যথাস্থানে যথা শব্দ ব্যবহার করিতে কখনও বিস্মৃত হন না। সাধারণ কথার মধ্যে তিনি মাঝে মাঝে এমন সব উপমা ব্যবহার করেন, যাহা প্রত্যেক শ্রোতার হৃদয়গ্রাহী হয়। এমন উপমাবহুল কথা খুব কম লোক বলিতে পারে। একদা শ্রীযুক্ত মহাদেব দেশাইয়ের সহিত তাঁহার কি একটা বিষয়ে আলোচনা হইতেছিল। দেশাই মহাশয় তাঁহাকে জনসাধারণের সরল বিশ্বাসের কথা উল্লেখ করেন এবং বলেন যে, এই সরল বিশ্বাসের কারণে তিনি সাফল্যের সহিত কতিপয় সংগ্রাম চালাইতে সক্ষম হন, ইহাতে মওলানা আজাদ একটা উপমা দিয়া বিষয়টাকে সুন্দর করিয়া বুঝাইয়া দেন। তিনি বলেন: "কিন্তু অসুবিধা এই যে, ধর্মবিশ্বাস এমন একটা শক্তি যাহার অপব্যবহার করিলে কল্যাণ অপেক্ষা অকল্যাণই বেশী হয়। একটি আনাড়ী গাড়োয়ানের হাতে একটা গরুগাড়ি পড়িলে দুর্বিপাক হইতে পারে। ইহাতে হয়ত চালকের কিছু ক্ষতি হইতে পারে, অথবা অন্য দু'একজনের সামান্য ক্ষতি হইতে পারে। কিন্তু রেলওয়ে দুর্ঘটনা হইতে কি ভয়ানক সর্ব্বনাশ হইয়া থাকে, তাহা সকলেই অবগত আছেন। তাহাতে শত শত জীবন নষ্ট হয়; ধনসম্পত্তিরও বহু অনিষ্ট হয়। ধর্ম্ম এই শক্তিশালী এন্‌জিনের মত তাহা সর্ব্বদা সুদক্ষ ও সদাজাগ্রত চালকের হাতে থাকা দরকার। অযোগ্য চালকের হাতে পড়িলে ইহা হইতে নানা

দুর্ঘটনা হইতে পাবে। আমাদের দেশের দুর্ভাগ্য এই যে, আজ ধর্ম্ম এই ধবণের অযোগ্য লোকের হাতে নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। তাহারা ইহাকে অধর্ম্মে পরিণত কবিয়াছে এবং আমরাও বুঝিতে পাবি না, আমরা কোথায় যাইতেছি।”

অনেকের ধারণা এই যে, মওলানা আজাদ ইংরেজি জানেন না, কিন্তু ইহা সত্য নহে। তিনি ইংবেজি কথা খুব কম বলেন, যদিও তিনি ইংরেজি খুব ভাল জানেন। তাঁহার গৃহেব পুস্তাকাগাব ইংরেজি ও ফরাসী ভাষার ক্লাসিক গ্রন্থে পূর্ণ। তিনি অনেক ইংবেজ কবিদের গ্রন্থ বহুবাব পড়িয়াছেন। সেকস্‌পিয়াব, মিল্টন, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, শেলী, বাইবন প্রভৃতি কবিদেব বহু গ্রন্থ তিনি অধ্যয়ন কবিয়াছেন। জগতের বড বড চিন্তাবীরেব যুগান্তকাবী গ্রন্থাবলী তাঁহার পাঠাগাবে স্থান পাইয়াছে। গ্যেটে, স্পিনোজা, রুশো, ভলটেয়ার, কার্লমার্ক্স, হ্যাভলক এলিস—এ সব লেখকেব গ্রন্থ তাঁহাব পাঠাগাবে আছে। উপনিষদ, বেদ, গীতা এ সবও আছে। People of All Nations Seriesএব সমুদয় গ্রন্থ, Historian's History of the World, Inter-national Library of Famous Literatureএব সমুদয় গ্রন্থ তাঁহাব পাঠাগাবে আছে। স্কটের ওয়েভাবলি নভেলের সমস্ত বইগুলি তিনি পডিয়াছেন। ডুমাব গ্রন্থ, হিউগোব গ্রন্থ এবং ফবাসী বিপ্লবেব যুগেব কবি ও লেখকদেব বহু গ্রন্থ তিনি একাধিকবাব পডিয়াছেন। ইতিহাস ও দর্শনের গ্রন্থগুলিই তিনি বেশী পছন্দ করেন। হিন্দু দর্শনেব বহু গ্রন্থ বিশেষ করিয়া ন্যায় বৈষেশিক দর্শনেব গ্রন্থগুলি পাঠ করিয়াছেন। আবার ম্যাডাম জিয়ান পম্পাদের গ্রন্থ তিনি পড়িয়াছেন।

হজরত মহম্মদ ও হজরত ওমর সম্পর্কীয় সদ্য প্রকাশিত গ্রন্থ তাঁহার টেবিলে আছে,—আর তাহারই পার্শ্বে Flaubert ও Madame Bovary গ্রন্থ পড়িয়া রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া যাইবে। ইহা ব্যতীত আরবী, ফারসী ও তুর্কি সাহিত্যের বহু গ্রন্থ তাঁহার টেবিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে, যাহাদের নাম এ দেশের বহু 'আলেম' এখনও জানেন না।

মওলানা আজাদ সকলের সহিত খুব মেলামেশা করেন না। কিন্তু তিনি চিঠিপত্রের দ্বারা বহির্জগতের সহিত আলাপ-আলোচনা করেন এবং এইভাবে অনেক বিশ্ববিখ্যাত মহাজনের সংস্পর্শে আসিয়াছেন। এই শ্রেণীর যে সব লোকের সহিত তিনি পত্রালাপ করিতেন, তাঁহাদের মধ্যে মিশরের জগলুল পাশা ও ফতেহ বে তাঁহার ব্যক্তিগত বন্ধু ছিলেন। মিশরে থাকিবার কালে তিনি ইঁহাদের সহিত মিশিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। তিনি তুরস্কের কামাল পাশা ও অন্যান্য নেতাদের সংস্পর্শে ছিলেন। প্রাচীন ও নব্য তুরস্কের সহিত তাঁহার যোগাযোগ ছিল। ১৯০৮ সালে নব্য তুরস্কের যে সব নেতা Committee of Union and Progress গঠন করেন এবং যাঁহারা দেশে বিপ্লব আনয়ন করিতে সমর্থ হন, তাঁহাদের অনেকেই তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। তুর্কি পার্লামেণ্টের স্পীকার আহমদ রেজা, ডাঃ সালাহ্‌উদ্দিন, আনওয়ার পাশা, জাবিদ বে—ইঁহাদের সহিত চিঠিপত্র বিনিময় করিতেন। ইরানের প্রগতিপন্থী দলের বিখ্যাত নেতা তাকি জাদেহ তাঁহার একজন বিশেষ বন্ধু। মওলানা আজাদের প্রকৃতির মধ্যে একটা কঠোর সংরক্ষিত ভাব আছে বলিয়া অনেকে তাঁহার ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্যের সংবাদ রাখেন না। কিন্তু তিনি সাধারণ চক্ষুর অন্তরালে থাকিয়া পৃথিবীর বহু সংবাদ রাখেন।

যাহারা তাঁহাকে বুঝিয়াছে, তাহারা তাঁহার পরামর্শ ও উপদেশ গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হয় না।

তাঁহার দৈনন্দিন জীবন-প্রণালী অতি সাদাসিধে ধরণের। তাঁহার গৃহে আসবাবপত্রের ছড়াছড়ি নাই। তাঁহার অফিস গৃহে ও ড্রইং রুমে রাশি রাশি পুস্তক ব্যতীত আর কিছুই দেখা যাইবে না। বদ অভ্যাসের মধ্যে সিগারেটেই তাঁহার আসক্তি। এ ছাড়া অন্য কোন অভ্যাস তাঁহার নাই। যখন কারাগারে যান, তখন তাহাও ছাড়িয়া দেন। তিনি প্রত্যুষে উঠেন। তিনি কোন আমোদ-প্রমোদের স্থানে যান না। সযত্নে সমস্ত প্রকার শোভাযাত্রা পরিহার করেন। তিনি একজন উচ্চ দরের বক্তা, কিন্তু demagogue নহেন। বিতর্ক সভায় তিনি সংযতভাবে প্রতিপক্ষের উত্তর দেন। কমিটি রুমে তাঁহার বাগ্মীতার চরম বিকাশ হয়। সেখানে তাঁহার সাক্ষাৎ সরল অন্তর্ভেদী বাগ্মীতার দ্বারা সভাগৃহকে আয়ত্তের মধ্যে আনিতে পারেন। কিন্তু তিনি জনসাধারণের লোক নহেন। তাই জনসাধারণ তাঁহাকে বুঝে না।

সমাপ্ত

পরিশিষ্ট

মওলানার পথ নির্দ্দেশ

প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে (১৯১২ খৃষ্টাব্দে) মনীষী মাওলানা আবুল কালাম আজাদ ভারতের লক্ষ্য-ভ্রষ্ট ও সম্মোহিত মুসলমানদিগকে তীব্র কশাঘাত করিয়া তাহাদের আশু মুক্তির জন্য "আল্-হেলাল্" পত্রে একটি প্রবন্ধে যে পথের নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন, তাহা বর্ত্তমান মুসলমানগণের প্রতি সমান ভাবে প্রযোজ্য। তাই তাহার কিয়দংশ অনুবাদ সহ নিম্নে দেওয়া গেল।

جو ہونے والا ہے اسکو کوئی قوم اپنی نحوست سے نہیں روک سکتی - یقیناً ایک دن آئیگا ' جبکہ ہندوستان کا آخری سیاسی انقلاب ہو چکا ہوگا ' غلامی کی وہ بیڑیاں جو اس نے خود اپنے پاؤں میں ڈال لی ہیں ' بیسویں صدی کی ہوائے حریت کی تیغ سے کٹ کر گر چکی ہونگی ' اور وہ سب کچھ ہو چکے گا ' جس کا ہونا ضروری ہے - فرض کیجئے کہ اس وقت ہندوستان کی ملکی ترقی کی ایک تاریخ لکھی گئی ' تو آپکو معلوم ہے کہ اسمیں ہندوستان کے سات کروڑ انسانوں کی نسبت کیا لکھا جائیگا ؟

اسمیں لکھا جائیگا کہ ایک بدبخت اور زبوں طالع قوم ' جو ہمیشہ ملکی ترقی کیلئے ایک روک ' ملک کی فلاح کیلئے ایک بدقسمتی ' راہ آزادی میں سنگ گراں ' حاکمانہ طمع کا کھلونا ' دست اجانب میں بازیچۂ لعب ' ہندوستان کی پیشانی پر ایک گہرا زخم ' اور گورنمنت کے ہاتھ میں ملک کی امنگوں کو پامال کرنے کیلئے ایک پتھر بنکر رہی ۔

اسمیں لکھا جائیگا کہ ایک غافل رحم مگر مسحور انسان کا گلہ، جسکے ہر مرد کو کسی زبردست کاهن نے اپنے منتر سے جانور بنادیا تھا، جو اپنے چلانے والے آقا کے ہاتھہ میں اپنے گردن کی رسی دیکھتی تھی اور خوش ہوتی تھی، جسمیں کوئی انسانی ارادہ، کوئی انسانی دماغ، کوئی انسانی حرکت، اور کوئی انسانی زندگی کا ثبوت نہ تھا - جو نہ اپنے دماغ سے سوچ سکتی تھی، نہ اپنی آواز سے بول سکتی تھی، اپنے پاؤں سے چل سکتی تھی، اور نہ اپنے ہاتھوں کو اپنا ہاتھہ سمجھکر اٹھا سکتی تھی ایک معمول، جو مسمرائزر کے ارادے پر زندہ ہو - ایک وجود شل، جو صرف زمین کیلئے بار ہو ایک درخت، جو حرکت کیلئے ہوا منتظر ہو، ایک پتھر جو بغیر کسی ذی روح کے حرکت دیے ہل نہ سکتا ہو، اور سب سے آخر یہ کہ ایک بد بختی کا داغ جو انسانیت کی پیشانی پر ہو،

پھر اسمیں لکھا جائیگا کہ یہ حالت اس قوم کی تھی، جو آہ ثم آہ! کہ "مسلم" تھی، جو اپنے ساتھہ انسانی شرف و جلال کی ایک عظیم ترین تاریخ رکھتی تھی، جسکو دنیا کی وراثت اور خلافت دی گئی تھی، جو دنیا میں اسلئیے بھیجی گئی تھی، تاکہ انسانی استبداد و استعباد کی زنجیروں سے بندگان الہی کو آزاد کرائے - جو اسلئیے بھیجی گئی تھی کہ بیڑوں کو کاٹے، نہ اسلئیے کہ خود اپنے پاؤں میں بیڑیاں پہنے، جو اسلئیے آئی تھی کہ تمام اُن زنجیروں کو، جو خدا کی بندگی کے سوا اور شیطانی قوتوں کی (اور ہر وہ استیلا جو اللہ کے ماسوا ہے، اسلام کی اصطلاح میں یہی نام رکھتا ہے) انسان کی گردنوں میں پڑی ہیں، ٹکڑے ٹکڑے کردئیے، نہ اسلئیے کہ سب سے بھاری زنجیر کو خود ہی اپنی گردن کا زیور بنائے - جو خدا کی نائب اور خلیفہ تھی - تاکہ دنیا کو اپنا محکوم بنائے - نہ یہ کہ خود محکومی پر نثار کرے - جسکے قدموں پر قوموں کو گرنا تھا تاکہ وہ اٹھائے - نہ یہ کہ وہ خود خاک مذلت و غلامی پر لوٹے اور ٹھکرائی جائے -

جو اس ملت حنفی کی پیرو تھی، جو دنیا میں صرف اسلئیے ہے کہ حاکم ہو - نہ اسلئیے کہ غلام و مملوک ہو - آہ! جو "مسلم" تھی اور پھر کوسا

انسانی شرف باقی رکھتا ہے ' جو اس اللہ کے منہہ سے نکلے ہوئے خطاب محبوب و اقدس میں نہیں ہے ؟ جو " مسلم " تھی اور اسلیئے قدرتی طور پر اسکا فرض تھا کہ ہندوستان میں وہ سب کچھہ کرتی ' جو اوروں نے کیا ' اور جسکو اپنے وجود زبوں سے اس نے ہمیشہ روکا - جو " مسلم " تھی - بس چاہئیے تھا کہ ہندوستان کی آزادی اور ملک کی ترقی کا جھنڈا اسکے ہاتھہ میں ہوتا ' اور ہندوستان کی تمام قومیں اسکے پیچھے پیچھے ہوتیں کیونکہ اسکے پاس " اسلام " تھا اور " اسلام " آگے رہنے کیلئے ہے - پیچھے رہنے کیلئے نہیں - وہ ایک قوت ہے تاکہ قومیں اسکے آگے جھک کر روحانی و جسمانی نجات پائیں پھر وہ کسی کے آگے جھکنے کا محتاج نہیں ہے -

آہ ! اے لوگو کہ میں نہیں سمجھتا تم کو کیا کہوں ' مجکو خدا را بتلاؤ کہ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ تم دین قدیم کے پیرو ' خطاب اسلام سے متصف ' اور امانت الہی کے حامل ہو ' یہ سچ ہے تو تم صرف اسلیئے ہو تاکہ نڈر ہو ' بے خوف ہو ' حری ہو ' آزاد ہو ' خود مختار ہو ' نہ صرف اتناہی کہ خود آزاد ہو ' بلکہ قوموں کو آزادی بخشنے والے اور ملکوں کو بند استعباد سے نجات دلانے والے ہو ' اور میں آگے بڑھتا ہوں کہ تم اسلیئے ہو ' تاکہ جانفروش ہو ' تاکہ راہ حق میں سر بکف ہو پھر یہ کیا ہے کہ یہ سب باتیں غیروں میں دیکھتا ہوں ' لیکن اے بدبختو ! تم ان سے محروم ہو - یہ کیا بوالعجبی اور کیا تماشاے عقل سوز ہے ؟

اگر تم کہو کہ تاریخ ہند میں ہمارے لئے بھی ایک شرف و عظمت کا باب ہوگا تو تم خاموش رہو ' اور مجھسے کہو کہ میں اسے پڑھدوں - بیشک ایک باب ہوگا ' مگر جانتے ہو کہ اس میں کیا ہوگا ؟ اس میں لکھا ہوگا کہ ہندوستان ملکی ترقی اور ملکی آزادی کی راہ میں بڑھا ' ہندوؤں نے اسکے لئے اپنے سروں کو ہتھیلی پر رکھا ' مگر مسلمان غاروں کے اندر چھپ گئے - انہوں نے پکارا ' مگر انہوں نے اپنے منہہ اور زبان پر قفل چڑھادے - ملک غیر منصفانہ قوانین کاشاکی تھا ' ہندوؤں نے اسکے لئے جہاد شروع کیا ' پر اس قوم مجاہد نے یہی نہیں کیا کہ صرف چپ رہی ' بلکہ مجنونانہ چیخ اوٹھی کہ تمام کام کرنے والے باغی ہیں -

یہ اور ایسے ہی حالت تھے جنمیں ملک مبتلا تھا - ہندو آئے اور انہوں نے اپنی تمام قوتوں کو ملکی جہاد کے لئے وقف کر دیا - لیکن عین اس وقت جبکہ وہ یہ سب کچھہ کر رہے تھے ' مسلمانوں نے نہ صرف اپنے ہی ہاتھہ پاؤں توڑے ' بلکہ چاہا کہ جنکے ہاتھہ پاؤں ہیں ' انکو بھی اپنا ہی سا لولا لنگڑا بنا دیں - جبکہ وہ ملک اور ملک کی آزادی کی آگ سلگا رہے تھے ' تو یہ تعلیم کی ایک ٹھنڈی لاش بنئے بیٹھے تھے ' انکے کانوں میں جادو کا منتر پھونکدیا گیا تھا کہ " وقت نہیں آیا " اور یہ اسی میں مسحور تھے - انکی الف لیلہ کا عفریت تھا ' جس نے جادو کے زور سے انکو پتھر کی چٹان بنا دیا تھا ' پس یہ ملک کی ترقی کی راہ میں روک بنکر پڑے تھے -

اسکے بعد وہ آنے والا مورخ جو ہندوستان کا وقائع نگار ہوگا ' لکھے گا کہ بالآخر وہ سب کچھہ ہوا جو ہونا تھا ' بیسویں صدی میں کوئی ملک غلام نہیں رہسکتا تھا اور نہیں رہا ' برٹش گورنمنٹ ایک کانسٹیٹیوشنل گورنمنٹ تھی ' چنگیز خاں کا تخت قہر نہ تھا - پس ملک آزاد ہوا اور انگلستان نے اپنا فرض ادا کر دیا - لیکن دنیا یاد رکھے کہ جو کچھہ ہوا ' اس قوم کی سرفروشی سے ہوا ' جو مسلم نہ تھی ' پر جو " مسلم " تھے ' انہوں نے ہمیشہ آزادی کی جگہ غلامی کی ' اور سر بلندی کی جگہہ سجدۂ مذلت کی کوشش کی - ہندوستان کی ملکی نجات یقیناً اپنی عظمت اور عزت کی یادگار ہے ' لیکن اس عزت میں مسلمانوں کا کوئی حصہ نہیں - اگر ملک کے قوانین کی ترمیم ہوئی ' نئے مفید قوانین بنائے گئے ' بربادکن محصولوں اور ٹیکسوں سے انسانوں نے نجات پائی - تعلیم جبری اور عام ہوئی فوجی مصارف میں تخفیف ہوئی اور سب سے آخر یہ کہ ملک کو حکومت خود اختیاری ملی ' تو صرف ہندوں قابل عزت ہندوں ' مسلمانوں کیلئے تازیانۂ عبرت ہندوں کی وجہہ سے ' کیونکہ انہوں نے پالٹکس کو شروع کیا اور پھر پالٹیکس اسی کو سمجھا ' مگر مسلمانوں نے اسکو معصیت سمجھکر کنارہ کشی کی ' اور جب شروع بھی کیا تو شیطان نے یہ سمجھایا کہ گورنمنٹ کے آگے سجدہ کریں ' یا اسکے آگے بھیک مانگنے کیلئے روئیں ' اور پھر مانگیں بھی تو اشرفی نہیں ' چاندی سونا نہیں ' لعل و جواہر نہیں ' بلکہ تانبے کا ایک زنگ آلودہ ٹکڑا ' یا سوکھی

روتي کے چند ریرے ! دلک مثل القوم الذین کذبوا بایاتنا ' فاقصص القصص لعلهم یتفکرون (۷ : ۱۷۵)

بیشک مدتوں کے بعد بند ٹوٹتے ' جس کو کفر کہا تھا اسکے ثواب و طاعت ہونے کا فتوا دینا پڑا ' لیکن کدونکر ؟ اپنی موت سے اپنے دماغ سے ' اپنی ہستی اور اپنی روح سے ؟ نہیں ناسکہ ع ان هم دسعی عمرۂ مردم شکار دوست '

پہلے جنکے حکم سے گمنامی کی غاروں میں چھپے تھے ' اب انہی کے حکم سے باہر نکلے تا کہ میدان میں جا کر انکے آگے سر بسجود ہوں - بیشک شملہ ڈیپوٹیشن کے تماشے کے بعد اسکا آخری پارٹ کھیلا گیا اور اسکا نام " لیگ " رکھا گیا ' لیکن اگر تم ایک برف خانہ بنا کر اسکا نام آتشکدہ رکھدوگے ' تو کیا برف کی سل آگ کا انگارہ ہو جائے گی ؟ اگر تم ایک کھلونے کا پتلا لیکر اسکے سینے کے پاس کی کل کو انگوٹھے سے دباوگے ' تا کہ اپنے دونوں ہاتھ ہلا کر تالی بجائے ' تو کیا اس تماشے سے وہ انسان کا بچہ سمجھ لیا جائے گا ؟ نادانوں ! چپ کیوں ہو ؟ مجھکو جواب دو ! شاید ہی اجتک دنیا میں کسی قوم نے پالٹکس کی ایسی صریح تذلیل و توہین کی ہوگی ' جیسی کہ چھ سال تک تم نے کی - تم نے ' اے چاندی اور سونے کو پوجنے والو ! تم نے کی - تمہارا وجود یکسر سیاست کی تحقیر - اور تمہارے اعمال اسکی معزز پیشانی پر ایک کلنک کا ٹیکا ہیں - تم نے غلامی کا ایک بتکدہ بنایا ' اور اسکا نام سیاست کی مسجد رکھا - تم نے سجدے کا سر جھکایا ' اور قوم کو دھوکا دیا کہ ہم عزت کا سر بلند کر رہے ہیں - تم دلدل میں اپنے پاوں ڈالکر کود رہے تھے ' تا کہ اور دھنسے و غرق ہو ' لیکن قوم کو کہتے تھے کہ ہم میدانوں میں دوڑ رہے ہیں - تم خود گمراہ تھے ' پھر اس پر بس نہ کی اور پوری قوم کو گمراہ کرنا چاہا - ضلوا واضلوا فویل لهم ولا تباعهم -

ہندو مسلمانوں کا سوال بھی ایک بازیگر کا کھیل ہے ' اور سنگدلی سے ناچنے والے ناچ رہے ہیں - یہ خیال کہ " تم نے ابھی تعلیم میں ترقی نہیں کی ' اسلیئے تمہارا پالٹکس یہی ہے کہ پہلے ہندوں سے اپنے غصب کردہ حقوق چھین لو " غور کرو کہ حریف شاطر کی کس قیامت کی چال تھی ؟

دنیا میں صداقت کیلئے جہاد اور انسانوں کو انسانی غلامی سے نجات دلانا تو اسلام کا قدرتی مشن ہے ' پس تم کو خدا نے آگے کرنا چاہتا تھا ' لیکن افسوس کہ تم نے پہلے خدا کو اور پھر اپنے آپ کو بھلایا ' نتیجہ یہ نکلا کہ پیچھے کی صفوں میں بھی تمہارے لیے جگہ نہیں - فیا حسرتا ! و یا ویلتا !!

ہندو مجارتی کی عمریت کا خوف بھی اب خدا کیلیئے دل سے نکال دیجئے ' - یہ سب سے بڑا شیطانی وسوسہ تھا ' جو مسلمانوں کے قلب میں القا کیا گیا - طاقت محض تعداد پر نہیں بلکہ اور باتوں پر موقوف ہے - اصل شي قوموں کی معنوی طاقت ہے - جو اسکو اخلاق ' اسکے کیرکٹر ' اسکے اتحاد ' اور در اصل ہماری اصطلاح میں خشیۃ الہی اور اعمال حسنہ سے پیدا ہوتی ہے - اسلام کی طاقت کبھی بھی وابستۂ دام ملت و کثرت نہیں رہی ہے - اور اب بھی جن دلوں میں اسلام ہو ' وہاں اکثریت بالکل بے اثر ہے - لا تہنوا و لاتحزنوا ' و انتم الاعلون ان کنتم مومنین -

یاد رکھئے کہ ہندوں کیلئے ملک کی آزادی کیلئے جد و جہد کرنا داخل حب الوطنی ہے ' مگر آپکے لیے ایک فرض دینی ' اور داخل جہاد فی سبیل اللہ - آپ کو اللہ نے اپنی راہ میں مجاہد بنایا ہے ' اور جہاد کے معنی میں ہر وہ کوشش داخل ہے ' جو حق اور صداقت ' اور انسانی بند استبداد و غلامی کے توڑ نے کیلیئے کی جاے - آج جو لوگ ملک کی فلاح اور آزادی کیلئے اپنی قوتوں کو صرف کر رہے ہیں ' یقین کیجئے کہ وہ بھی مجاہد ہیں اور ایک ایسے جہاد میں مصروف ' جس کے لئے در اصل سب سے پہلے آپ کو اٹھنا تھا - پس اٹھہ کھڑے ہو ' بیدار ہوں - ہندوستان میں تم نے کچھہ نہیں کیا - حالانکہ اب تمہارا خدا چاہتا ہے کہ یہاں بھی وہ سب کچھہ کرو ' جو تم کو ہر جگہ کرنا ہے ۔

(Dec. 18. 1912 " الہلال ")

সারাংশ—স্বাধীনতার ইতিহাসে ভারতের ৭ কোটি মানুষের সম্বন্ধে কি লিখিত হইবে জানেন? তাহাতে লিখিত হইবে যে, এক হতভাগ্য জাতি সর্ব্বদা দেশের উন্নতির প্রতিবন্ধক, কল্যাণের প্রতিরোধক, স্বাধীনতার কণ্টক এবং সরকারের হাতের ক্রীড়নক ছিল। হায়! সে জাতির নাম মুসলমান এবং যাহার গৌরবমণ্ডিত অতীত

ছিল। সে পৃথিবিতে এই জন্য প্রেরিত হইয়াছিল যেন সে আল্লার সৃষ্ট জীবকে স্বাধীন করে। দাস ও পরাধীন হইবার জন্য সে পৃথিবীতে প্রেবিত হয় নাই। যে জাতি মুসলমান তাহারই স্বাধীনতার পতাকা হস্তে ধারণ করা সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য ছিল। দেশের শ্রীবৃদ্ধি ও স্বাধীনতার জন্য হিন্দুগণ তাহাদের সর্ব্বস্ব পণ করিযাছিল, আব মুসলমানগণ গহ্বরের মধ্যে লুকাইল। হিন্দুগণ জেহাদ শুরু করিল, আব মুসলমানগণ কেবল নীরব বহিল না, বরং উন্মাদের মত চিৎকাব করিযা উঠিল যে, উক্ত দেশ-কর্ম্মিগণ বিদ্রোহী।

বিংশ শতাব্দীতে কোন দেশই পরাধীন থাকিতে পাবে না, এবং থাকিবেও না। স্মরণ রাখিবেন—ভারতে যাহা কিছু হইবে তাহা সেই জাতির আত্মত্যাগে হইবে—যাহাবা মুসলমান নহে। যাহারা মুসলমান ছিল তাহারা সর্ব্বদা স্বাধীনতার স্থানে গোলামীকে বরণ করিয়াছিল। ভারতেব যেটুকু উন্নতি হইয়াছে তাহা সম্মানীয হিন্দুদেব দ্বারাই হইয়াছে এবং শয়তান মুসলমানদিগকে এই বুঝাইল যে, গবর্ণমেণ্টেব সামনে যেন তাহারা মাথা নত করে, অথবা ক্রন্দন সহকাবে ভিক্ষা করে।

নিশ্চয় শিমলা ডেপুটেশনের তামাশাব পর উহাব শেষ খেলা হইল এবং উহার নাম রাখা হইল "লীগ"। হিন্দু-মুসলমানের সমস্ত এক সুদক্ষ যাদুকবের খেলা। দুর্ভাগ্যবশতঃ তোমাকে সে এই বলিয়া নাচাইতেছে যে, "তোমরা এখনও শিক্ষায় উন্নতি লাভ করিতে পার নাই। তাই হিন্দুদের নিকট হইতে তোমাদের অধিকাব সর্ব্বাগ্রে ছিনাইয়া লওয়া কর্ত্তব্য।"

"হিন্দু মেজরিটির" যে ভুত তোমাদিগকে পাইয়া বসিযাছে, দোহাই খোদা, তাহা এক্ষণে দূরে নিক্ষেপ কবিয়া দাও। ইহা শযতানী মনোভাব যাহা মুসলমানের হৃদয়ে বদ্ধমূল করা হইয়াছে। শক্তি কেবল সংখ্যার উপর নির্ভর করে না, বরং অন্যান্য বিষয়ের উপর ইহা নির্ভর করে। সংখ্যার অল্পতা ও আধিক্যের উপর ইসলামেব শক্তি কখনও নির্ভর করে নাই। যাহার অন্তরে ইসলাম বিবাজ কবিবে, সে কখনও সংখ্যাধিক্যে বিভ্রান্ত হইবে না।

স্মরণ রাখিবেন দেশেব স্বাধীনতা অর্জ্জনের জন্য প্রচেষ্টা হিন্দুদেব পক্ষে স্বদেশ-প্রেমের অন্তর্গত। আর উহা মুসলমানের পক্ষে ধর্ম্মীয় ফরজ অর্থাৎ অবশ্য করণীয় কাজ এবং "আল্লার জন্য প্রচেষ্টার" অন্তর্গত।

সত্যের জন্য সংগ্রাম এবং মানবকে স্বাধীন ও মুক্ত করা তো ইসলামেব শাশ্বত, চিরন্তন "মিশন"। এক্ষণে উঠ, জাগ্রত হও, আল্লার পথে অগ্রসব হও। (আল হেলাল, ১৮ই ডিসেম্বর, ১৯১২ সাল)